রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ-করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি-করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম—নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন—"ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কি বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"দাদা, রাজধর শৃগালের মত গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল। আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম—তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না! তুমি কি না বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না! কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই—আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কখন ভীরুতা দেখাইয়াছি! আমি কি শত্রু সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কি দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না!"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—"ভাই আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইষা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইষা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন—"না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না!"

ইষা খাঁ বলিলেন—"তবে থাক্! এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহত হৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময়ে সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইষা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন রাজধর মনে মনে কহিলেন—"আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব!"

তাহার পর দিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া

দিলেন। সেই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্ম বিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্য সমেত স্বদেশাভিমুখে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন—এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের মুখে যাত্রা করিতেছেন তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগ সৈন্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইষা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন—"আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন কর।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"পলাইলেও ত একদিন মরিতে হইবে!" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন "পলাইবই বা কোথা! এখানে মরিবার যেমন স্থবিধা পলাইবার তেমন স্থবিধা নাই! হে ঈশ্বর, সকলই তোমারই ইচ্ছা!"

ইষা খাঁ বলিলেন—"তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক্।" বলিয়া প্রাচীর-বৎ শত্রু সৈন্যের এক দুর্ব্বল অংশ লক্ষ্য সমস্ত সৈন্য বিদ্যুৎ বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পলাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইষা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন—তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইষা খাঁ শত্রুর বূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্ব্বতের শিখর পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন এমন সময়ে এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতীর পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতী যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মত ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন সে ফিরিল না। অবশেষে যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্ব্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতীর পিঠ হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্র বর্ণ ছোট ছোট বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত পা কাটামুণ্ড ও মৃত-দেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ—তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনেরবেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে

যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল—অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্ত্তনাদ অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মন্থিত হইতে ছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কি অগাধ শান্তি—কি সুগভীর বিষাদ! মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালায় চারিদিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই প্রাণ নাই চেতনা নাই হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। একদিকে পর্ব্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে—একদিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ ছয়টা করিয়া বড় বড় গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখা প্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন তখন যুবরাজ কর্ণফুলী নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলী পূরিয়া জলপান করিতেছেন মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখবুজিয়া আসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল্‌কুল্ করিয়া নদীর জল বহিয়া যাইতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে—বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণ হৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন তখন আকাশ পাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল! চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত তুলিয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন—"আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণ কোনমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি! আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোন কষ্ট নাই!" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—মৃদুস্বরে বলিলেন "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল!"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে!"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাত যোড় করিয়া কহিলেন—"দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম এখন তোমার কোলে স্থান দাও!" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পারে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের

মুদিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট।

বিজয়ী মগ সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট সাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে তখন কল্যাণ মাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

সূর্য্যকিরণের ঢেউ।

সূর্য্য-কিরণ জিনিষটা কি, জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলিবেন, সূর্য্যকিরণ সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যের আলো; আবার কি? সূর্য্যের কিরণ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিবার আছে। সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে আসিয়া পৃথিবী স্পর্শ করে, এই জন্যই বোধ করি তাহাকে সূর্য্যের কর অর্থাৎ সূর্য্যের হাত বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যকিরণকে ঠিক সূর্য্যের হাত বলা যায় না—কেন যায় না নীচে লিখিতেছি।

মনে কর একটা পুকুরের দুই পারে দুই ঘাট আছে। এক ঘাটে তুমি স্নান করিতেছ এক ঘাটে আমি স্নান করিতেছি। দূর হইতে তোমাকে স্পর্শ করিতে হইলে হয় তোমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে হয় নয় জলে এমন ঝাঁকানী দিতে হয় যে এ-পার হইতে জলের ঢেউ গিয়া ও-পারে তোমার গায়ে লাগে। তোমার সঙ্গে আমি যখন কথা কই তখন কি প্রকারে সেই শব্দ তোমার কর্ণে যায়? তখন ত আমার মুখ হইতে কোন দ্রব্য তোমার কর্ণে ছোঁড়া হয় না। তখন আমার মুখের কাছের বাতাস নাড়া পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে এইরূপে বাতাসে ঢেউ উঠিয়া একটার পর আরেকটা করিয়া শেষ ঢেউটা

তোমার কর্ণে যে ঢাকের মত চর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত করে। দূরের দ্রব্য ছুঁইবার এই দুই প্রকার উপায় আমরা জানি প্রথমতঃ কোন জিনিষ ছুঁড়িয়া এবং আঘাত করিয়া, দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যের প্রতি গতি বা ঢেউ প্রদান করিয়া, জল ও বাতাসের গতি তাহার উদাহরণ।

পণ্ডিত নিউটনের বিশ্বাস ছিল যে সূর্য্যকিরণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা নির্ম্মিত, সূর্য্য সেই কিরণগুলি আমাদের চোখের উপর ছুঁড়িয়া আমাদের চোখে অনবরত আঘাত করিতেছে। চোখে ঘুসি খাইলে আমরা যেমন তারার মত সাদা সাদা জিনিষ দেখিতে পাই, কিম্বা পিঠে চাপড় খাইলে আমরা যেমন সে স্থান গরম বোধ করি সেইরূপ এই সূর্য্যের কণাগুলির আঘাতে আমরা আলো দেখিতে পাই, ও উত্তাপ অনুভব করি। অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকেরা নিউটনের এই মত সত্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেছে। নিউটন যখন এই মত লিখিয়াছিলেন তখন ডেন্মার্ক দেশের হিগেন্স নামক অন্য এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে পুকুরের ছোট ছোট ঢেউ গুলি যেমন এপার হইতে ও-পারে যায়, সূর্য্য হইতে আলোক সেইরূপ ছোট ছোট ঢেউয়ের আকারে আমাদের এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। কিন্তু কথা এই—ঢেউ উঠিবে কি করিয়া? আমরা যখন ফুঁ দিয়া অথবা হাত নাড়িয়া অথবা পাখা দিয়া বাতাসে ঘা দিই তখন বাতাসে ঢেউ উঠে—জলে ঘা দিলে জলে ঢেউ উঠে। তেমনি সূর্য্য কোন্ জিনিযে ঘা দেয় যাহাতে করিয়া কিরণের ঢেউ উঠে? হিগেন্স এ বিষয় ভালরূপ স্থির করিতে পারেন নাই।

এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহতারা এবং আমাদের পৃথিবী, ইহাদের মধ্যেকার আকাশে এমন কোন বস্তু আছেই যাহা বাতাস ও জল অপেক্ষা ঢের সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম যে কাঁচ, কাঠ ইঁট প্রভৃতির ন্যায় দৃঢ় বস্তুর মধ্যে দিয়াও ইহার গমনাগমন আছে। ইহাকে আমরা দেখিতে পাই না। ইহাকে আমরা "ঈথর" বলি। এই ঈথর সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছে। যে পর্য্যন্ত না তোমরা নিজে ঈথর সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবে, সে পর্য্যন্ত তোমরা সার জন হার্শেল ও অন্যান্য পণ্ডিতদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া এইটি মানিয়া লও যে অবশ্য ঈথর সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে দিয়া ইহার গমনাগমন আছে। সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহতারা এই ঈথরের মধ্যে ভাসিতেছে। অতএব সূর্য্যে বা গ্রহতারায় একটা যদি আন্দোলন উপস্থিত হয় তবে এই ঈথরে অবশ্যই তাহার ঘা লাগে। জলে যদি মাছ ধড়ফড় করে তবে তাহার চতুর্দ্দিকের জল নড়িতে থাকে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার গ্যাস অর্থাৎ বাষ্প তুমুল মাতামাতি করিতেছে। তাহারা যখন পরস্পর অত্যন্ত জোরে ঘর্ষিত হইয়া এত আলো ও উত্তাপ সৃজন করিতেছে, তখন কি তোমার মনে হয় না যে এই প্রবল ঘর্ষণে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকের ঈথরও কম্পিত হইবে? সেই ঈথর আবার যখন সূর্য্য ও

পৃথিবীর মধ্যেকার সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে, তখন কি তোমার মনে হয় না যে পুকুরের জলের ঢেউয়ের মত সূর্য্যের নিকটস্থ ঈথর কাঁপিয়া আমাদের নিকটে তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছে? সূর্য্যের চতুর্দ্দিক হইতে অবিশ্রাম একটা র পর আরএকটী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ সকল এই প্রকারে ঈথর অবলম্বন করিয়া আমাদের পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীর মধ্যস্থ ভারতবর্ষের অংশটুকু যখন সূর্য্যের সম্মুখে আসে, তখন সেই ঢেউগুলি ভারতবর্ষের জল স্থলকে আঘাত করিয়া উত্তপ্ত করে, এবং আমাদের চক্ষুর স্নায়ু সকলকে আঘাত করে বলিয়া আমরা আলোক দেখিতে পাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চক্ষুতে একটী ঘুসি মারিলে আমরা ক্ষণ কালের জন্য তাহার ন্যায় সাদা সাদা জিনিষ দেখিতে পাই। ইহাকেই চলিত ভাষায় "সরিষা-ফুল-দেখা" বলে। সূর্য্যের সহস্র সহস্র ঢেউ আমাদের চক্ষুতে প্রতি পলকে অনবরত আঘাত করিলে আমরা যে সমস্ত দিন অবিশ্রাম আলোক দেখিতে পাইব ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সূর্য্য যখন অস্ত যায় তখন আমরা নক্ষত্রদিগের কাছ হইতে কতকটা আলো পাইয়া থাকি। তবে তাহারা সূর্য্যের চেয়ে আরো অধিক দূরে আছে বলিয়া তাহাদের কাছ হইতে আমরা এত অল্প আলো পাই। সূর্য্য অস্ত না গেলে তাহাদের আমরা দেখিতে পাই না। আশ্চর্য্য এই যে ঈথরের ঢেউ আমরা ঠিক দেখি নাই বটে, কিন্তু তাহাদের আমরা মাপিয়াছি, তাহারা কত বড় তাহা জানি। এক ইঞ্চি জায়গায় কতগুলি ঢেউ প্রবেশ করিতে পারে তাহাও আমরা জানিয়াছি। কি করিয়া মাপা হইয়াছে তাহা বুঝাইতে গেলে বিস্তর গোল বাধিবে। না বুঝিবারই বেশী সম্ভাবনা। এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ঈথরের ঢেউগুলি এত ক্ষুদ্র যে এক ইঞ্চি জায়গায় প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার ঢেউ ধরিতে পারে।

এখন দেখা যাউক কিরূপ বেগে এই ঢেউগুলি চলিয়া থাকে। গতবারে বালকে বলিয়াছি যে দ্রুতগামী রেলগাড়িতে চড়িলে ১৭১ বৎসরে সূর্য্যের নিকট যাওয়া যায়, কিন্তু সূর্য্যের এই সূক্ষ্ম ঢেউ গুলি চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ৭½ মিনিটে পৃথিবীতে আইসে। যে সকল ঢেউ তোমার চক্ষুকে এই মুহূর্ত্তে আঘাত করিতেছে, তাহারা কেবল ৭½ মিনিট হইল সূর্য্যকে ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহারা বিশ্রাম না করিয়া একটার পর একটী করিয়া, কামানের গোলার ন্যায় সমস্ত দিন তোমার চোখের উপর পড়িতেছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে এত তাড়াতাড়ি তাহারা পৃথিবীতে আসে যে প্রতি পলকে ৬০৮,২৫৬,০০০,০০০,০০০, ঢেউ তোমার চক্ষে পতিত হয়। এই বৃহৎ সংখ্যা মনে রাখিবার কোন আবশ্যক নাই, তবে এই অদৃশ্য ঢেউ সকল যে অতিশয় সূক্ষ্ম ও অতিশয় কার্য্যক্ষম তাহাই তোমরা মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা কর।

কাঞ্চন-শৃঙ্গা।

(দার্জ্জিলিং।)

আমরা যেদিন দার্জ্জিলিঙে পৌছলুম, সেদিন রাত্রি থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। আমার এম-এ বন্ধুটি ঘরের মধ্যে জ্বরে অঘোর হয়ে আছেন, বাইরে বৃষ্টি, স্থতরাং দার্জ্জিলিং সহরটা দেখবার কোন সম্ভাবনাই রইল না। গ-বাবু ও আমি দুজনে মিলে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে বসে নানা গল্প করতে লাগ্‌লুম। একদিন এই রকম করে রইলুম। দ্বিতীয় দিনে দার্জ্জিলিঙের একটি ডাক্তার গ-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে তিনি আমাকে বল্‌লেন যে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাক্‌লে দুচারদিনের মধ্যেই বাতে ধরবে, বৃষ্টি হলেও গায়ে রবরের কাপড় পরে বেড়ান বিশেষ আবশ্যক। বন্ধুটিকে গ-বাবুর জিম্মের দিয়ে আমি সেই কাপড় পরে ত বেড়াতে বেরলুম। প্রথম দিন পাহাড়ে উঠতে আমার যে কষ্ট হয়েছিল তা বল্‌বার নয়। বৃষ্টি পড়ে রাস্তা পিছল হয়েছে, তাতে আবার এক এক জায়গায় ঢালু রাস্তা, যদি পা পিছ্‌লে যায় ত একেবারে ইহলোক থেকে পিছলে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যাহোক্‌, সন্ধ্যের কিছু পূর্ব্বে একলা বেড়াতে বেরিয়ে খানিকদূর ত গেলুম। পাহাড়ে চড়াও রাস্তায় উঠতে প্রথম প্রথম মনে হয় যেন বুক্‌টা ফেটে গেল, কষ্ট হলে খানিকটা বিশ্রাম করে আবার উঠতে হয়। পাহাড়ে উঠে যখন খানিকদূর গেলুম তখন বেশ সন্ধে হয়েছে, মেঘ খুব ঘনিয়ে এসেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বেশি দূর যাওয়া উচিত না মনে করে ফিরলুম। যখন পাহাড়ে উঠছিলুম তখন রাস্তাগুলো ভাল করে নজর করি নি, মনে করেছিলুম যে যেমন যাবার সময় পাহাড়ে উঠচি, তেমনি ফেরবার সময় হুস্‌হুস্‌ করে নাবলেই হবে। নাববার সময় কোন কষ্ট হয় না বরং একটু আরাম হয়। নাব্‌তে লাগ্‌লুম, নাব্‌তে নাব্‌তে এ রাস্তা ও রাস্তা করে দু ঘণ্টা ফিরেছি, বাড়ি খুঁজে পাইনি। তখন আমার মনে বড় ভয় হল। আমি সেই অন্ধকারে যূথ-ভ্রষ্ট হরিণের মত একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা রকম বিভীষিকা ভাব্‌ছি। সুখের বিষয় এই যে আমার এম-এ বন্ধুর মত আমি ভূতের ভয় পাইনে, তা যদি পেতুম তা হলে বোধ হয় এই খানেই পঞ্চভূত (পঞ্চত্ব) প্রাপ্ত হতুম, কারণ যদি কোথাও ভূত দেখবার সম্ভাবনা থাকে ত এই খানে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, পাহাড়ের উপরে পাহাড় এমন কি আকাশ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চে না, তাতে মেঘ, তাতে আবার গাছের উপর বৃষ্টি ও বাতাস লাগাতে খুব একটা শব্দ হচ্চে। মনে মনে নিজের অজ্ঞতা ও অদৃষ্টকে তিরস্কার করচি, এমন সময় দূরে আশা-বিজলীর ন্যায় একটি পথিককে দেখ্‌তে পেলুম। কাছে যখন এল তখন দেখি যে সে একটি ভূটিয়া মুটে। তাকে ঠিকানা বলাতে ও কিছু

পুরস্কার দিতে স্বীকার করায় সে আমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেল। গ-বাবু ও আমার বন্ধুকে যখন এই গল্প করলুম তখন তাঁরা দুজনে মিলে আমাকে তিরস্কার করতে লাগ্‌লেন। তখন এই প্রতিজ্ঞা করলুম যে বরং বাতে ভুগ্‌ব, তবু একা পাহাড়ে বেড়াব না।

চারদিনের দিন বন্ধু বেশ সেরে উঠলেন, আর সে দিন মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেল। বন্ধুটিকে আস্তে আস্তে গাড়িতে চড়িয়ে দিলুম, তিনি কল্‌কাতায় ফিরে গেলেন। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে যা যা দেখলুম তার কতকটা লিখি।

ছেলেবেলায় ভূগোল-বৃত্তান্তে পড়েছি বটে যে "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" হিমালয়ের একটি শিখর। হিমালয় ত দেখ্‌লুম, কিন্তু "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" দেখা আজ পর্য্যন্ত হ'ল না, মেঘ হলে চতুর্দ্দিক ভাল দেখা যায় না।

গ-বাবু অনেক দিন থেকে দার্জ্জিলিঙে আছেন, তিনি এখানকার আকাশের গতিক এক রকম বুঝে নিয়েছেন। যে দিন বৃষ্টি থাম্‌ল ও আমার বন্ধু গেলেন, সেদিন গ-বাবু হিসেব করে আমাকে বল্‌লেন, "এখন বৃষ্টি থামল, বিকেলের মধ্যে মেঘ কেটে যাবে, রাত্রে জ্যোৎস্না হবে, কাল আমরা "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" স্পষ্ট দেখতে পাব।" যাহোক—কালকের জন্য অপেক্ষা করে রইলুম। এখন কাঞ্চন শৃঙ্গা সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিব।

সিকিম ও তিব্বতের লোকেরা ইহাকে "কন্‌-চিন্‌-জোঙ" বলে; তাহার অর্থ "কন্‌=তুষার," "চিন্‌=পূর্ণাবৃত," "জোঙ"=চিরকালীন। অর্থাৎ চিরতুষারমণ্ডিত। বাঙ্গলা বইয়ে কেহ কেহ এ'কে "কাঞ্চন-জঙ্ঘা" বলেন, আমরা ইহাকে "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" বলিলাম। ইহা সমুদ্র থেকে ২৪,১৭৭ ফিট উঁচু। দার্জ্জিলিং সবে মাত্র ৭১ ৬৫ ফিট উঁচু, "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" দার্জ্জিলিং থেকে প্রায় চারগুণ উঁচু। এখানে আজ পর্য্যন্ত কোন লোক যেতে পারে নি, পারবে কি না জানিনে। ১৮৫২ খৃঃ অঃ অর্থাৎ সিপাহী যুদ্ধের পাঁচ বৎসর আগে কাপ্তেন সারউইল "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" সম্বন্ধে সমস্ত তন্নতন্ন করে জানবার জন্যে দার্জ্জিলিঙে যাত্রা করেন। সেই সময় সেখানে এত ভয়ানক ভূমিকম্প হয় যে "কাঞ্চন-শৃঙ্গার" দক্ষিণ-পশ্চিমের কত হাজার হাত পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। সারউইল সাহেব এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখ্‌লেন যে যেখানটা ভেঙ্গে গেছে সেখানটা অত্যন্ত অন্ধকার গুহার মত হয়ে গেছে।

গ-বাবুর কথামত বিকেলে সমস্ত মেঘ কেটে গেল, রাত্রে জ্যোৎস্না হ'ল। তাঁর বাড়ির উপরের তলায় একটি ঘর ছিল তার একদিকের দরজা গুলো সমস্ত কাঁচ দিয়ে ঘেরা, শুয়ে শুয়ে বাইরের সমস্ত দেখা যায়। "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" দেখব বলে আমি সেই ঘরে রাত্রে শুলুম। মনে এত কৌতূহল হয়েছিল যে ঘুম হল না। রাত্রি যখন তিনটে তখন গ-বাবু বাইরের দিকে একবার চেয়ে বললেন—"ঐ দেখুন কাঞ্চন-শৃঙ্গা দেখা যাচ্ছে। যদিও খুব শীত, তবু লেপকম্বল ফেলে দেখি যে জ্যোৎস্নাতে সম্মুখে একসার
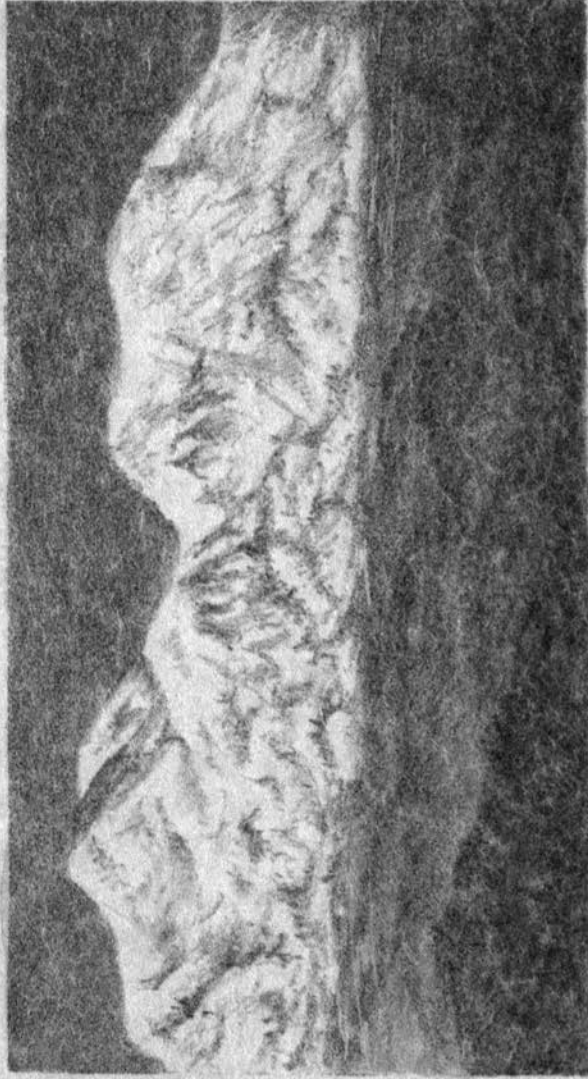
কাঞ্চন শৃঙ্গ।

ফিকে নীল ও সাদা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। যখন ভোর হ'ল অর্থাৎ যখন অরুণোদয় হ'ল তখন অল্প লাল হ'ল, ক্রমে সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণবর্ণ হয়ে শেষে একেবারে সাদা ধবধব করতে লাগ্‌ল। তখন দেখ্‌তে এমন চমৎকার বোধ হ'ল যে তা বর্ণনা করা যায় না। তুষার শ্রেণী একদিক থেকে অপর দিক পর্য্যন্ত গোলাকারে দার্জ্জিলিংকে ঘিরে রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী মাথায় হিমালয়ের মুকুট পরেছে, কাঞ্চনশৃঙ্গা তার উপরে দীপ্ত হীরকের স্তবক। "কাঞ্চন শৃঙ্গা" দেখলে মনে এক মহান্ অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তখন আমার এই কবিতাটি মনে হ'ল—

"শিরে তব চন্দ্র-সূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছ বহন।
তুষার ধবল শির, ছেলে খেলা পৃথিবীর
ভ্রুক্ষেপে যেন সব করিছ দর্শন।

"কাঞ্চন-শৃঙ্গা" দেখে আমার সেটি আঁকতে বড় ইচ্ছা হ'ল। গ-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ও আঁকবার সরঞ্জম হাতে করে বেরিয়ে পড়লুম। দার্জ্জিলিঙের মধ্যে Observatory Hill বলে একটি পাহাড় আছে—তার উপর থেকে "কাঞ্চন শৃঙ্গা" এবং তার পাশের চারিদিকের ছোট ছোট রকমের পাহাড়ের শ্রেণীও অতি পরিষ্কার দেখা যায়। সেখানে বসে আমি "কাঞ্চন-শৃঙ্গা" শ্রেণী এঁকে নিলুম, তার মধ্যে যে পাঁচটি শৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাই তোমাদের জন্যে আঁকলুম। সর্ব্বাপেক্ষা যেটি বেশি উঁচু দেখিতেছ ঐটি "কাঞ্চন-শৃঙ্গা", অন্য চারিটির আলাদা নাম আছে।

চিরঞ্জীবেষু।

ভায়া, নবীনকিশোর, এখনকার আদব কায়দা আমার ভাল জানা নাই—সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ বা প্রথম চিঠিপত্র আরম্ভ করিতে কেমন ভয় করে। আমরা প্রথম আলাপে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু শুনিয়াছি এখনকার কালে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা দস্তুর নয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বাবার নাম আমার অবিদিত নাই, কারণ আমিই তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলাম। ভাল নাম দিতে পারি নাই—গোবর্দ্ধন নামটা হঠাৎ মুখে আসিল সেইটেই দিয়া ফেলিয়াছি। এই জন্যই বোধ করি সে দিন যখন ন্যায়রত্ন মহাশয় তোমাকে তোমার ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তুমিই না হয় তোমার বাবার নূতন নামকরণ কর। আমার গোবর্দ্ধন নাম আমি ফিরাইয়া লইতেছি।

আসল কথা কি জান? সেকালে আমরা নাম লইয়া এত ভাবিতাম না। সেটা হয়ত

আমাদের অসভ্যতার পরিচয়। আমরা মনে করিতাম, নামে মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে। মন্দ কাজ করিলেই মানুষের বদ্‌নাম হয়, ভালকাজ করিলেই মানুষের সুনাম হয়। বাবা কেবল একটা নামই দিতে পারে কিন্তু ভাল নাম কিম্বা মন্দ নাম সে, ছেলে নিজেই দেয়। যে দিন আমার গোবর্দ্ধন নিজের মুদির দোকান-টুকু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে না, পৃথিবীর একটা উপকার করিতে পারিবে সেই দিন গোবৰ্দ্ধন নামটা এমন ভাল হইয়া উঠিবে যে তুমি পর্য্যন্ত বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলে নিতান্ত চটিয়া উঠিবে না!

ভাবিয়া দেখ আমাদের প্রাচীন কালের বড় বড় নামগুলিতে নিতান্ত মধুর নয়। যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, ভীম দ্রোণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, জন্মেজয় বৈশম্পায়ন ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল নাম শ্যামল শোভা ও বিপুলচ্ছায়া লইয়া অক্ষয় বটের মত আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে সহস্র শিকড়ে বিরাজ করিতেছে। আমাদের আজকালকার উপ-ন্যাসে ললিত, নলিন, মোহন প্রভৃতি কত মিঠি মিঠি নাম বাহির হইতেছে, কিন্তু এখন-কার পাঠক পিপীলিকারা এই মিষ্টকণাগুলিকে দুই দণ্ডেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে—সকালের নাম বিকালে টিঁকে না। যাহাই হউক, আমরা নামের প্রতি বেশী মনো-যোগ করিতাম না। তুমি বলিতেছ, সেটা আমাদের ভ্রম। সে জন্যে বেশী ভাবিও না ভাই, আমরা শীঘ্রই মরিব এমন সম্ভাবনা আছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজের সমস্ত ভ্রম সমূলে সংশোধিত হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখনকার আদবকায়দা আমার বড় জানা নাই। কিন্তু ইহাও দেখিতেছি আদব কায়দা এখনকার দিনে নাই, আমাদের কালেই ছিল। এখন বাপকে প্রণাম করিতে লজ্জা বোধ হয়, বন্ধুবান্ধবকে কোলাকুলি করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, গুরুজনের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া তাস পিটিতে লজ্জা বোধ হয় না, রেলগাড়িতে যে বেঞ্চে পাঁচজন ভদ্রলোক বসিয়া আছে তাহার উপরে দুই খানা পা তুলিয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না। তবে হয়ত আজকাল অত্যন্ত সহৃদয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আদবকায়দার তেমন আবশ্যকই নাই। সহৃদয়তা! তাই বুঝি কেহ পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজ রাখে না! বিপদ আপদে লোকের সাহায্যে করে না। হাতে টাকা থাকিলে সামান্য জাঁকজমক লইয়াই থাকে, দশজন অনাথকে প্রতিপালন করে না। তাই বুঝি পিতা মাতা অযত্নে অনাদরে কষ্টে থাকে অথচ নিজের ঘরে সুখ স্বচ্ছন্দতার অভাব নাই—নিজের সামান্য অভাবটুকু হইলেই রক্ষা নাই—কিন্তু পরিবারের আর সকলের গুরুতর অনটন হইলেও বলেন হাতে টাকা নাই। হাতে টাকা নাই এই নিমিত্ত কেবল নিজেরই জন্য গাড়িঘুড়ি রহিয়াছে, পিতার বাহিরে যাইবার সুবিধার জন্য একটা ভাঙ্গা ছাতি ও এক যোড়া ছেঁড়া চটি আছে—যে ঘরে হাওয়া আসে সে ঘর নিজের ব্যবহারের জন্য, আর যে ঘরে হাওয়া যায় না এবং মশক ব্যতীত আর কোন জীব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যায় না

সেই ঘর পিতামাতা এবং আমাদের মত অনাবশ্যক লোকদের জন্য নিযুক্ত আছে। এই ত ভাই এখনকার সহৃদয়তা! মনের দুঃখে অনেক কথা বলিলাম। আমি কালেজে পড়ি নাই সুতরাং আমার এত কথা বলিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা কিছু আমাদের নিন্দা করিতে ছাড় না, আমরাও যখন তোমাদের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলি সে কথাগুলোয় একটু কর্ণপাত করিও!

চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তোমাকে কি "পাঠ" লিখিব এই ভাবনা প্রথম মনে উদয় হয়। একবার ভাবিলাম লিখি, "মাই ডিয়ার নাতি," কিন্তু সেটা আমার সহ্য হইল না; তারপরে ভাবিলাম বাঙ্গালা করিয়া লিখি "আমার প্রিয় নাতী" সেটাও বুড়-মানুষের এই খাগ্‌ড়া কলম দিয়া বাহির হইল না। খপ্‌ করিয়া লিখিয়া ফেলিলাম, "পরম শুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু।" লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভাবিলাম—ছেলেপিলেরা ত আমাদিগকে প্রণাম করা বন্ধ করিয়াছে তাই বলিয়া কি আমরা তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিব! তোমাদের ভাল হউক ভাই, আমরা এই চাই, আমাদের যা হইবার তা হইয়া গেছে। তোমরা আমাদের প্রণাম কর না কর আমাদের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের আছে। ভক্তি করিতে যাহাদের লজ্জা বোধ হয় তাহাদের কোন কালে মঙ্গল হয় না। বড়র কাছে নীচু হইয়া আমরা বড় হইতে শিখি, মাথাটা তুলিয়া থাকিলেই যে বড় হই তাহা নয়। পৃথিবীতে আমার চেয়ে উঁচু আর কিছু নাই, আমি বাবার জ্যেষ্ঠতাত আমি দাদার দাদা, এইটে যে মনে করে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহার চক্ষু এত ক্ষুদ্র যে সে আপনার চেয়ে বড় জিনিষের প্রতিবিম্ব দেখিতেই পায় না, তাহার হৃদয় এতই ক্ষুদ্র যে সে আপনার চেয়ে বড় কিছুই কল্পনাও করিতে পারে না। তুমি হয়ত আমাকে বলিবে, "তুমি আমার দাদা মহাশয় বলিয়াই যে তুমি আমার চেয়ে বড় এমন কোন কথা নাই।" আমি তোমার চেয়ে বড় নই! তোমার বাপ আমার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছেন, আমি তোমার চেয়ে বড় নই ত কি! হৃদয় ঢালিয়া তোমাকে স্নেহ দিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার আছে। তোমার সে ক্ষমতা নাই। আমি তোমাকে স্নেহ করিতে পারি বলিয়াই আমি তোমার চেয়ে বড়, হৃদয়ের সহিত তোমার কল্যাণ কামনা করিতে পারি বলিয়াই আমি তোমার চেয়ে বড়। তুমি না হয় দুটো পাঁচটা ইংরাজি বই আমার চেয়ে বেশী পড়িয়াছ, তাহাতে বেশী আসে যায় না। আঠার হাজার ওয়েব্‌ষ্টর ডিক্‌সনারীর উপর যদি তুমি চড়িয়া বস তাহা হইলেও তোমাকে আমার হৃদয়ের নীচে দাঁড়াইতে হইবে, তবুও আমার হৃদয় হইতে আশীর্ব্বাদ নামিয়া তোমার মাথার উপরে বর্ষিত হইতে থাকিবে। পুঁথির পর্ব্বতের উপরে চড়িয়া তুমি আমাকে নীচু নজরে দেখিতে পার, তোমার চক্ষের অসম্পূর্ণতাবশতঃ আমা.ক ক্ষুদ্র দেখিতে পার, কিন্তু আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পার না। স্নেহ উচ্চের উচ্চে বিরাজ করিতে

থাকে স্বর্গে তাহার সিংহাসন, আর দাম্ভিকতা ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া থাকে পৃথিবীর ধূলা জড় করিয়া সে উঁচু। দাম্ভিকতা উল্কার মত একদিন খসিয়া পড়ে, স্নেহ ধ্রুবতারার মত চিরদিন স্থির। যে ব্যক্তি মাথা পাতিয়া অসঙ্কোচে স্নেহের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারে সে ধন্য, তাহার হৃদয় উর্ব্বরা হইয়া ফলে ফুলে শোভিত হইয়া উঠুক্। আর যে ব্যক্তি বালুকাস্তূপের মত মাথা উঁচু করিয়া স্নেহকে উপেক্ষা করে সে তাহার শূন্যতা, শুষ্কতা, শ্রীহীনতা তাহার মরুময় উন্নত মস্তক লইয়া মধ্যাহ্নের তেজে দগ্ধ হইতে থাকুক্! যাহাই হউক্ ভাই, আমি তোমাকে একশবার লিখিব, "পরম শুভাশীর্ব্বাদ রাশয়ঃ সন্তু" তুমি আমার চিঠি পড় আর নাই পড়।

তুমিও যখন আমার চিঠির উত্তর দিবে, প্রণাম পূর্ব্বক চিঠি আরম্ভ করিও। তুমি হয়ত বলিয়া উঠিবে "আমার যদি ভক্তি না হয় ত আমি কেন প্রণাম করিব! এ সব অসভ্য আদব-কায়দার আমি কোন ধার ধারি না!" তাই যদি সত্য হয় তবে কেন ভাই তুমি বিশ্বসুদ্ধ লোককে "মাইডিয়ার" লেখ! আমি বুড়, তোমার ঠাকুর দাদা, আজ সাড়ে তিন মাস ধরিয়া কাশিয়া মরিতেছি তুমি একবারও খোঁজ লইতে আসনা, আর জগতের সমস্ত লোক তোমার এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে মাইডিয়ার না লিখিয়া থাকিতে পার না! এও কি একটা দস্তর মাত্র নয়। কোনটা বা ইংরাজি দস্তর কোনটা বাঙ্গালা দস্তর। কিন্তু সেই যদি দস্তরমতই চলিতে হইল তবে বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গলা দস্তরই ভাল। তুমি বলিতে পার "বাঙ্গলাই কি ইংরাজিই কি কোন দস্তর কোন আদবকায়দা মানিতে চাহি না। আমি হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া চলিব!" তাই যদি তোমার মত হয়, তুমি সুন্দরবনে গিয়া বাস কর, মনুষ্য সমাজে থাকা তোমার কর্ম্ম নয়। সকল মানুষেরই কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে; সেই কর্ত্তব্য শৃঙ্খলে সমস্ত সমাজ জড়িত। আমার কর্ত্তব্য আমি না করিলে তোমার কর্ত্তব্য তুমি ভালরূপে করিতে পার না। দাদা-মহাশয়ের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে নাতির কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। তুমি যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার আদেশ পালন কর, তবেই তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। আর, তুমি যদি বল, আমার মনে যখন ভক্তির উদয় হইতেছে না তখন আমি কেন দাদামহাশয়ের কথা শুনিব, তাহা হইলে যে কেবল তোমার কর্ত্তব্যই অসম্পূর্ণ রহিল তাহা নহে তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্যেরও ব্যাঘাত হয়। তোমার দৃষ্টান্তে তোমার ছোট ভাইরাও আমার কথা মানিবে না, দাদামহাশয়ের কাজ আমার দ্বারা একেবারেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই কর্ত্তব্য পাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য অবিশ্রাম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, সমাজে অনেকগুলি দস্তর প্রচলিত আছে। সৈন্যদের যেমন অসংখ্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় নহিলে তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, সকল মানুষকেই তেমনি সহস্র দস্তরে বদ্ধ থাকিতে হয় নহিলে তাহারা

সমাজের কার্য্যপালনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। যে গুরুজনকে তুমি প্রণাম করিয়া থাক, যাঁহাকে প্রত্যেক চিঠি পত্রে তুমি ভক্তির সম্ভাষণ কর, যাঁহাকে দেখিলে তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, ইচ্ছা করিলেও সহসা তাঁহাকে তুমি অমান্য করিতে পার না। সহস্র দস্তর পালন করিয়া এম্‌নি তোমার মনের শিক্ষা হইয়া যায় যে গুরুজনকে মান্য করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে, না করা তোমার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন দস্তর সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমরা এই সকল শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। ভক্তিস্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, পারিবারিক সম্বন্ধ উল্টাপাল্টা হইয়া যাইতেছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মিতেছে। তুমি যে, দাদা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া চিঠি আরম্ভ কর না, সেটা শুনিতে অত্যন্ত সামান্য বোধ হইতে পারে কিন্তু নিতান্ত সামান্য নহে। অনেকগুলি দস্তর আমাদের হৃদয়ের সহিত জড়িত, তাহা কতটুকু দস্তর কতটুকু হৃদয়ের কার্য্য বলা যায় না। অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা প্রণাম করি কেন? প্রণাম করাও ত একটা দস্তর। এমন দেশ আছে যেখানে ভক্তিভরে প্রণাম না করিয়া আর কিছু করে। আমরা প্রণাম না করিয়া হাঁ করি না কেন? প্রণামের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তির বাহ্যলক্ষণ স্বরূপ এক প্রকার অঙ্গভঙ্গী আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে; যাঁহাকে আমরা ভক্তি করি, তাঁহাকে স্বভাবতই আমাদের হৃদয়ের ভক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়,—প্রণাম করা সেই ভক্তি দেখাইবার উপায় মাত্র। আমি যদি প্রণাম না করিয়া ভক্তিভরে তিনবার হাততালি দিই, তাহা হইলে যাঁহাকে ভক্তি করিলাম তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, এমন কি তাহা অপমান জ্ঞান করিতে পারেন। ভক্তির সময়ে হাততালি দেওয়াই যদি দস্তর থাকিত তাহা হইলে প্রণাম করা অত্যন্ত দোষের হইত সন্দেহ নাই। অতএব, দস্তরকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, হৃদয়ের অভাব প্রকাশ করি বটে!

অতএব আমাকে প্রণাম পুরঃসর চিঠি লিখিবে—ভক্তি থাক্ আর নাই থাক্। সে দেখিতে বড় ভাল হয়। তোমার দেখাদেখি অন্য পাঁচ জন দাদা মহাশয়কে ভদ্ররকম চিঠি লিখিতে শিখিবে এবং ক্রমে ভক্তি করিতেও শিখিবে।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

একরাত্রি।

(বালকের রচনা)

বসন্তের মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। গাছপালাগুলি শ্যামল পত্রের নূতন বসন পরিধান করিয়া যৌবনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ এক দিনে বর্দ্ধমান হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থিত একটী মাঠে একটী মনুষ্যের আব্ছা আব্ছা ছায়া দেখা যায়।

দিবাকর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রামলাভার্থে অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। পৃথিবী এখন তাঁহার তীব্র কটাক্ষপাতের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। চন্দ্রমা একটু একটু করিয়া আপনার হাসিহাসি ঢলঢল মুখখানি বাহির করিতেছেন, মেঘগুলি হিংসায় সেই মধুমাখা মুখখানি আপনাদের কালো কালো কাপড় দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতাস থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার সজোরে সোঁ সোঁ করিয়া উঠিতেছে। বৃষ্টি পড়িব-পড়িব করিতেছে কিন্তু বোধ হয় বসন্তের খাতিরে পড়িয়া লজ্জায় পড়িতে পারিতেছে না। ঠিক এইরূপ সময়ে সেই ছায়াটীকে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটে দেখিতে পাওয়া গেল।

বৃক্ষটী বহুদিনের পুরাতন। উহা ঐ স্থানে যে কত দিন হইতে বিরাজিত তাহা কেহই বলিতে পারে না। নিকটস্থ গ্রামের বৃদ্ধদিগের মতে ঐ বৃক্ষটী তাঁহাদিগের প্রপিতামহের বয়স্ক। কিন্তু তাহাও তাঁহারা নিশ্চয় বলিতে পারেন না। গাছটীর চারিধারে মাটী উঁচু করিয়া একটী বসিবার স্থান প্রস্তুত আছে। ঐ উচ্চ ঢিপির নিম্নদেশে চারিধারে সবুজ রঙের ঘাস। নিকটস্থ গ্রামের কৃষকগণ যখন মাঠে চাষ করিতে আসে, তখন মাঝে মাঝে ঐ বৃক্ষতলস্থ ঢিপির উপর বসিয়া বিশ্রাম করে। দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ঐ বৃক্ষটী কৃষকদিগের একমাত্র আশ্রয় স্থান। বিকালবেলায় দু'-একদিন দুই চারিটী অল্পবয়স্ক বালককেও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ঐ গাছটীর চারিধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে। কখনও কখনও খেলিতে খেলিতে দুই একটী বালকের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদও হইয়া থাকে, কিন্তু হাতাহাতি বড় একটা হয় না। গাছটীর নিম্নদেশে এক-আধ দিন দুই চারিটী বৃদ্ধেরও সমাগম হয়। ছুটাছুটীর পরিবর্ত্তে বৃদ্ধদিগের মধ্যে তাসখেলা দাবাখেলা ও খোস গল্পেরই কিছু প্রাদুর্ভাব, এই জন্য যে দিন বৃদ্ধ-সমাগম হয় সেদিন গ্রামের নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ধান্য কি রকম হইল, এবৎসর কয় আনা আন্দাজ হইবে, কা'র ঘরের

"কিস্তিমাৎ"
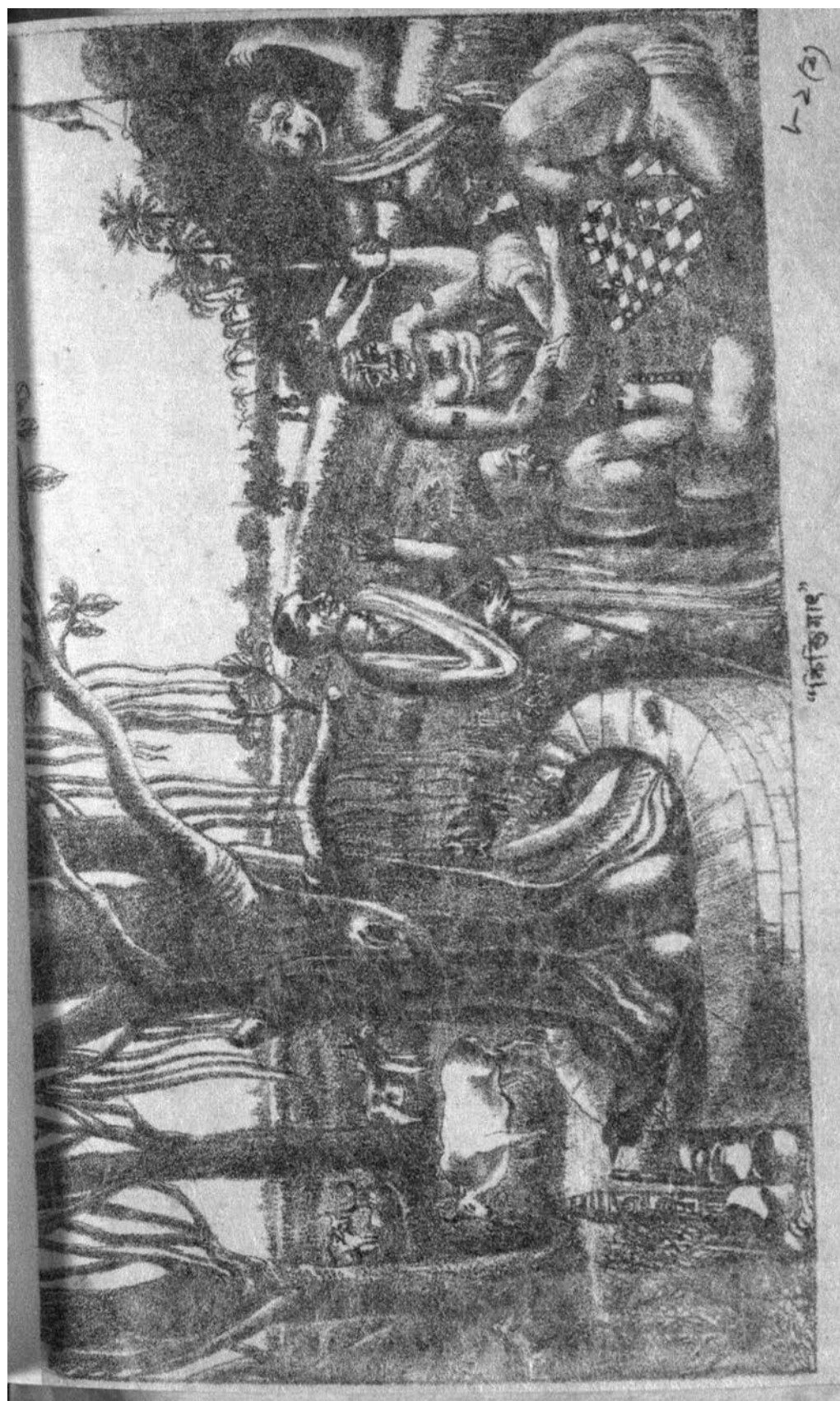
চালে কটা কুমড়া হইয়াছে, অমুকের বিবাহ কবে, পাত্রটী কেমন, এবং ইহা বাদে অমুক কেমন লোক, অমুক কেমন খাইতে পারে, কা'র বাড়ী আজ কি রান্না হইয়াছিল, এবং পরিশেষে কে কেমন ভোজন করাইতে পারে, ইত্যাদি নানা রকম কথা সে দিন সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল কথার মাঝে মাঝে 'ইস্তক পঞ্চাশ' 'কীস্তিমাৎ' প্রভৃতি দুই চারিটী কথার উচ্চনিনাদ, এবং তাসপেটার 'চটাশ্‌চট্' শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ শব্দের সহিত হুঁকার 'ভুড়ুক্ ভুড়ুক্' শব্দ খানিকটা করিয়া ধোঁয়ার সহিত আকাশে উত্থিত হইতে থাকে। বৃক্ষটীর একটী উচ্চ ডালে একটা বেশ বড় রকমের মধুমক্ষিকার চাক আছে। সেই চাকের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মৌমাছিরা প্রায়ই গান করিতে থাকে। বৃক্ষটি সেই গুন্ গুন্ শব্দে নিদ্রাপরবশ হইয়া মধ্যাহ্নকালে বাতাসে ঢুলিতে থাকে। গাছটীর গাত্রে স্থানে স্থানে প্রায়ই দু' একটা পিপীলিকার দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গগুলির নিকটে যাইলে অনেক সময় মনুষ্য মহারাজগণকেও বিপদে পড়িতে হয়। বাল্যকাল হইতে সৈনিক কার্য্য শিক্ষা করিয়া পিপীলিকা সৈন্যগণ তাহাতে এত পাকা যে তাহাদের কোন কার্য্যই বড় একটা সৈনিক ধরণধারণের বিপরীত হয় না। তাহারা সৈন্য শ্রেণীর ন্যায় সারি সারি চলিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় নানা স্থান হইতে আসিয়া পাখীগুলি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ডালে ডালে কিচিমিচি করিতে থাকে। রাত্রিকালে গাছটী নীরবে বসিয়া কত কি ভাবিতে থাকে—কত দুঃখের সুখের কথা তাহার মনে পড়ে, কত অতীতের কথা তাহার সেই বৃহৎ গুঁড়িটার মস্তকে আসিয়া উপস্থিত হয়, কত বালকের খেলা, কত বৃদ্ধের মাথা চুলকান, কত হুঁকার বাদ্যধ্বনি, এবং কত শত মধুমক্ষিকার গুণ্ গুণ্ গান তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, অবশেষে কখন নিশীথে নিদ্রা আসিয়া স্বপ্নে তাহার ডালপালা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

পথিক এক্ষণে সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া এক একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। মেঘের ছিদ্র দিয়া দুই চারিটীমাত্র তারা দেখা যাইতেছে। দূর হইতে বজ্রের গম্ভীর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে; অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা মাঠের বক্ষে বক্ষে আঘাত করিতেছে। কিন্তু বৃষ্টি অধিক পড়িতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে তড়্‌বড়্ করিয়া দুই চারি ফোঁটা মাত্র বৃষ্টি পড়িতেছে, আবার থামিয়া যাইতেছে। চন্দ্রমা এক একবার মেঘের কৃষ্ণসাগরে ডুব দিতেছেন আবার এক-একবার আপনার সেই মধুমাখা মুখ পৃথিবীর দিকে তুলিতেছেন। বৃক্ষের নিম্নদেশদিয়া একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট শৃগাল দৌড়িয়া গেল। পথিক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না যে কি গেল, সুতরাং পথিকের মন কল্পনার সর্ব্বোচ্চ ডালে চড়িয়া বাদুড়ের মত দোদুল্যমান হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে শৃগালপাল 'হুক্কাহুয়া' রবে চীৎকার করিতেছে, দু' একটা খেঁকীকুকুর শৃগালদিগকে সাড়া দিতেছে, ইহা ভিন্ন সে সময় ঐ স্থানে আর অন্য কোনও শব্দ হয়

নাই। পথিক এই সকল শব্দ শুনিয়া এক-একবার চমকিয়া উঠিতেছে। রাত্রি অধিক হয় নাই। চন্দ্রমা মেঘের জালায় কোন্‌দিক দিয়া মুখ বাড়াইবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। এদিকে বৃক্ষটীর একটী কোমল পত্র আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িতেছে—এখনও পৃথিবীর বক্ষ স্পর্শ করে নাই। একটী বাছড় একাকী নিঃশব্দে গগন পথে সন্তরণ করিতে করিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে পথিকের মনে কে জানে এক কি ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক মনে মনে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' করিতে লাগিল। ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর ঘুমের ঘোরে একটি পাখী ডানা ঝাড়া দেয়, তাহারই ঝট্‌পট‌শব্দ পথিকের ভয়ের কারণ। পথিক কল্পনা চক্ষুর দ্বারা কি সব অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাইল, এবং স্থির করিল যে উহারাই কোথায় যেন উস্‌খুস্‌ করিতেছে। এই ভাবিয়াই তাহার প্রাণটা 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছিল।

চাঁদ আর দেখা যায় না। কেবল ঘোর কালো মেঘের ভিতর দিয়া একস্থানে কা'র একটী চাপা হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই জলে অশ্বত্থ বৃক্ষটী মনের সাধে স্নান করিতেছে, সেই জলপান করিয়া মাঠের ফসলগুলি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে, ঘাসগুলি আপন গাত্র হইতে মনুষ্যের ও অন্যান্য জীবের পদধূলি ধুইয়া পরিষ্কার হইতেছে। পথিক জলে ভিজিয়া ভিজিয়া এক একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, মেঘগুলিকে প্রকাশ্যে নাহোক্ মনে মনে গালি দিতে ছাড়িল না। খুব খানিকটা বৃষ্টি হইয়া মেঘ শীঘ্র কাটিয়া গেল। বৃষ্টি থামিয়া গেল। চন্দ্রমা এতক্ষণে মেঘের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া পৃথিবীর সমস্ত জলস্থলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পথিক আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আকাশে মেঘ না থাকাতে পূর্ণিমার চাঁদ আবার হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সেই স্নিগ্ধ আলোকের জ্যোতি বৃক্ষের পত্রে, ঘাসের শ্যাম মখমলের উপর প্রতিফলিত হইতেছে। নালা নর্দ্দমায় জল দাঁড়াইয়াছে, সেই জলের মধ্যে জ্যোৎস্নালোক ঝিকিমিকি করিয়া খেলা করিতেছে। পথিক এখন ধীরে ধীরে একটীর পর একটী করিয়া পদ অগ্রসর হইতেছে। কাদার উপরে পা পড়াতে পথিকের পদতল, পথিকের পাঁচটী অঙ্গুলি কর্দ্দমের উপর অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। চলিতে চলিতে পথিক মাঝে মাঝে দুই এক খাবল করিয়া মুড়ি খাইতেছে।

পথিকের রং শ্যামবর্ণ, দেখিতে নেহাৎ মন্দ নহে, ললাটদেশের দক্ষিণভাগে একটী আঁচিল আছে, সেই আঁচিলের চারিধারে দুই চারি গাছি পাতলা চুল ফর্‌ফর্ করিতেছে; তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে তাহারা যেন এক একটী 'তাল পত্রের সিপাহী'। ললাটদেশের বামভাগে একটী কাটা দাগ আছে, সেটী বোধ হয় বাল্যকালে পড়িয়া যাওয়ার দাগ। নাসিকা মধ্যমগোছের, সেই নাসিকাগিরির দুইটী গহ্বর হইতে অবি-শ্রাম ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইতেছে। পথিকের হস্তে একটী বংশের লাঠি ও একটী

মান্ধাতার আমলের ছাতি। ছাতিটীতে যে বিশেষ জল আটকায় তাহা ত বোধ হয় না। পথিকের স্কন্ধ দেশে একটী ঝুলি। সেই ঝুলির মধ্যে পথিকের 'সর্ব্বস্ব' বিদ্যমান। তেল বল, তামাক বল, মুড়ী বল, মুড়কী বল যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সেখানে সব আছে। পথিকের বিষয় যাহা বলা হইল ইহাই হইয়াছে; সুতরাং এইবারে আস্তে আস্তে সরা যাউক্।

আকাশের তারাগুলি সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা এক একটী করিয়া বিশ্রামের জন্য আকাশ গর্ভে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, সূর্য্যদেব সমস্ত রজনী নিঃশব্দে ঘুমাইয়া এখন উঠিবার জন্য পাশ ফিরিতেছেন, পূর্ব্বদিক্ শীঘ্রই প্রাতঃ সূর্য্যের রক্তিমা-ছটায় রঞ্জিত হইবে। আমরা পথিকের সহিত একরাত্রি জাগরণ করিয়া এখন ধীরে ধীরে গৃহে ফিরি।

দুর্ভিক্ষ।

(বালিকার রচনা)

সকলেই বোধ করি শুনিয়াছ আজ কাল বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় ভয়ানক অন্নকষ্ট হইয়াছে। সেখানে যাও দেখিবে যে-প্রদেশ একদিন শস্য রাশিতে পরিপূর্ণ ছিল সেখানে আজ সবুজ রঙ আর দেখা যায় না। কত শত লোক অন্ন অন্ন করিয়া মরিতেছে। তাহাদের সমস্ত দিনে অন্য কোনও কার্য্য নাই, কোনও চিন্তা নাই, কেবল অন্ন হা অন্ন! কোথায় অন্ন, করিয়া তাহারা কাঁদিয়া মরিতেছে, তবু ত তাহারা একমুঠা অন্ন পাইতেছে না।

তুমি ভোরে উঠিয়া মুখ ধুইতেছ তখনও তাহারা অন্ন অন্ন করিয়া কাঁদিতেছে, আবার তুমি তোমার কাজ কর্ম্ম সারিয়া দুপুর বেলায় ভাত খাইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা দেখিতেছ, তখনও তাহারা অন্ন অন্ন করিতেছে, আবার তুমি ঘুমের থেকে উঠিয়া, তোমার যা কাজ করিবার আছে করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইলে তখনও তাহারা অন্ন অন্ন করিয়া কাঁদিতেছে, আবার তুমি যখন রাত্রে শুইতে যাইতেছ, তখনও শুনিতে পাইবে, তাহারা অন্নের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষণের মধ্যেও তাহাদের এক মুষ্টি অন্ন জুটে নাই।

ভাই তোমরা রোজ রোজ কত শত রকম খাবার খাও, কত বিড়াল কুকুরকে দাও, কত ফেলিয়া দাও তাহার ঠিক নাই। কিন্তু বেচারা সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকেরা বেশী নয় কেবল এক মুঠা মাত্র অন্নের জন্য গ্রামে গ্রামে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। তুমি যত অন্ন রোজ ফেলিয়া দাও, তাহার সিকি ভাগও যদি তাহাদের মধ্যে

একজন কাহাকেও দাও, তাহা হইলে সে মনে করে না-জানি কত খাবারই পাইলাম! সে আজ যাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল তাহাকে শতবার ধন্যবাদ দেয়।

আজ কাল অনেক সহৃদয় লোক অন্নছত্র খুলিয়া তাহাদের অনেক উপকার করিতেছেন। অনেক সহৃদয় লোক নিজে ঐ প্রদেশে যাইয়া, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা নিজে উপস্থিত থাকিয়া, সেই সকল অভাগাদের স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারাই ধন্য। দরিদ্রেরা তাঁহাদের দয়া দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এখন অন্নাভাব ছাড়িয়া দাও। আর একটী যে ভয়ানক অভাব হইয়াছে তাহাই বলি। মনে কর তুমি অনেকক্ষণ জল খাও নাই। তোমার জলতৃষ্ণা পাইল। তুমি তোমার চাকরকে জল আনিতে বলিলে। তাহার জল আনিতে কিছু বিলম্ব হইতেছে। এদিকে তোমার তৃষ্ণাও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন যদি দেখ জল আর আসেই না, তখন তোমার রাগ ছাড়িয়া দাও,—কি ভয়ানক কষ্ট হয়! তোমার প্রাণ যেন কেমন হাঁসফাঁস করিতে থাকে। মানুষ জল না হইলে থাকিতে পারে না। বরং অন্ন না খাইয়াও দুদিন থাকা যায়, কিন্তু জল (তৃষ্ণা পাইলে) না খাইয়া দুদণ্ড থাকা যায় না। আজ সেই জলাভাব। আমরা এখানে জল লইয়া স্নান করিতেছি, জল লইয়া ঘর সাফ করিতেছি—জলের কল খুলিয়া কত জল নষ্ট করিতেছি, তাহারা জল খাইতে পাইতেছে না। আমরা হয় ত অনেকে গঙ্গার জল ঘোলা বলিয়া খাইতে চাহি না, কিন্তু তাহারা কাদা ছাঁকিয়া একটু জল পাইলে খাইয়া বাঁচে। কলিকাতায় একবেলা কলের জল বন্ধ হইলেই আমরা মনে করি জলকষ্ট হইয়াছে, অথচ সম্মুখে গঙ্গা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে পুষ্করিণী শুষ্ক, কূপ শুষ্ক, আকাশেও মেঘ নাই। এইরূপে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার বস্ত্রাভাবও হইয়াছে। এখন আমরা কি এই হতভাগ্য দরিদ্রদের সাহায্য করিব না? তোমরা হয়ত বলিবে "আমরা আবার সাহায্য করিব কি? আমরা কোথায় অত টাকা পাব? আমরা ছেলে মানুষ আমরা আবার কি করব? কিন্তু ভাই অমন কথা বলিও না। আমরা ছেলে মানুষ সত্য। কিন্তু ছেলে মানুষের দ্বারা কি কোন কার্য্য হইতে পারে না।

এখানে একটা উপযুক্ত উদাহরণ দেওয়া যাক্।

* ১৮৭৩ সালে যখন বাঙ্গালায় ও বেহারে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য বিলাতের লোকেরা চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করে। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠে। এই সময়ে কয়েক জন বাঙ্গালী বিলাতে ছিলেন।

---

* এইটী সত্য ঘটনা। ইহা "শিশুর সদাচার" নামক একটী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

তাঁহাদের মধ্যে একজনের এক দিন এক সাহেবের বাড়ী চা খাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। ভদ্রলোক ও সেই পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ ও শিশু সন্তান যখন টেবিলে চা পান করিতে বসিলেন তখন দেখা গেল যে শিশু সন্তানদের চায়ে চিনি দেওয়া হইল না। শিশুরা স্বভাবতঃ মিষ্টপ্রিয়। অথচ আর সকলকে চিনি দেওয়া হইল কেবল তাহাদের দেওয়া হইল না। ইহা দেখিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী বিস্মিত হইয়া গৃহকর্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, বাঙ্গালার লোক অন্নাভাবে মরিতেছে শুনিয়া ইহারা সংকল্প করিয়াছে যে যত দিন না দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইবে, তাহারা চিনি খাইবে না। ইহাদের চিনিতে যে পয়সা ব্যয় হইত সেই পয়সা ইহারা প্রতি সপ্তাহে দান সংগ্রহের বাক্সে স্বহস্তে প্রদান করে।

তাহা হইলে দেখ দেখি ভাই, এত দূরদেশবাসী শিশুসন্তানেরা বাঙ্গালীর দুঃখমোচনের জন্য এমন সাধু সংকল্প করিয়াছিল, যদিও বাঙ্গালীরা তাহাদের আপনার জাতি নয়; তবে আমরা আমাদের স্বজাতির দুঃখ মোচনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিব না? শত শত লোক যে আজ আমাদের প্রতি আকুল নয়নে চাহিয়া কাঁদিতেছে, আমরা কি একবারও তাহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিব না! আমরা যখন নিজে সুখে আহার করিতে যাইতেছি আর অতগুলি লোক আমাদের মুখপানে চাহিয়া আছে, তখন আমরা আগে উহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া না দিয়া নিজে গ্রহণ করিব!

ভাই তোমরা প্রায় রোজই পয়সা লইয়া কত রকম খেলানা কিনিয়া থাক। কত ঘুড়ি, মারবল, ব্যাট, বল, পুতুল, ঘটী, বাটী প্রভৃতি কতই কেন। ওই সকল জিনিষ কিনিতে তোমার যত ব্যয় হয় তাহার অর্দ্ধেকও যদি দরিদ্রদের দান কর, তাহা হইলে কত সৎব্যয় হয়? ভাই সেই ইংরাজ সন্তানদের কথা মনে করিয়া দেখ দেখি। তাহারা না খাইয়া দরিদ্রদের জন্য পয়সা বাঁচাইয়াছিল, আর তোমরা কি দুই দিন না খেলিয়া তাহাদের জন্য পয়সা বাঁচাইতে পারিবে না? তুমি যদি তোমার খাবার হইতে বাঁচাইতে পার ত বাঁচাও, কিন্তু ভাই আগে যে গুলি মিথ্যা ব্যয় করিতেছ, তাহা সৎকার্য্যে লাগাও, তবে খাবার হইতে বাঁচাইবে।

তবে এস আমরা আজি সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করি যে আমাদের যথাসাধ্য পরের উপকার করিতে চেষ্টা করিব ও ঐ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব আমরা যখনই কোনরূপ পয়সা বাঁচাইতে পারিব, এক পয়সাই পারি, দু পয়সাই পারি, আর যতই পারি না কেন, উহাদের জন্য রাখিব। আমরা যদি, দয়াময় পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া এই কার্য্যে রত হই, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের শুভ সংকল্প সুসিদ্ধ হইবে।

হেঁয়ালি-নাট্য।

সূর্য্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।

আমোদ-প্রমোদ কর এ কথা যে বলিতে হয় এই আশ্চর্য্য! কিন্তু আমাদের দেশে এ কথাও বলা আবশ্যক। আমরা হৃদয় মনের সহিত আমোদ করিতে জানি না। আমাদের আমোদের মধ্যে প্রফুল্লতা নাই, উল্লাস নাই, উচ্ছ্বাস নাই। তাস পাশা দাবা পরনিন্দা ইহাতে, হৃদয়ের বা শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে না। এ সকল নিতান্তই বুড়োমি, কুণোমি, কুঁড়েমি। দায়ে পড়িয়া, কাজে পড়িয়া, ভাবনায় পড়িয়া সময়ের প্রভাবে আমরা ত সহজেই বুড়ো হইয়া পড়িতেছি, এ জন্য কাহাকেও অধিক আয়োজন করিতে হয় না। ইহার উপরেও যদি খেলার সময় আমোদের সময় আমরা ইচ্ছা করিয়া বুড়োমির চর্চ্চা করি তবে যৌবনকে গলা-টিপিয়া বধ করা হয়। যতদিন যৌবন থাকে ততদিন উৎসাহ থাকে, প্রতিমুহূর্ত্তে হৃদয় বাড়িতে থাকে, নূতন নূতন ভাব নূতন নূতন জ্ঞান সহজে গ্রহণ করিতে পারি, নূতন কাজ করিতে অনিচ্ছা বোধ হয় না, বিশ্বসুদ্ধ লোক এবং অনুষ্ঠানের উপর অবিশ্বাস জন্মে না, আশা উদ্যমকে বিসর্জ্জন দিয়া পরম বিজ্ঞ হইয়া তাম্রকূটের ধূম ও পরনিন্দা লইয়া দাওয়ায় বসিয়া একাধিপত্য করিতে ইচ্ছা যায় না; হৃদয়ের যৌবন চলিয়া গেলে হৃদয়ের বৃদ্ধি আর হয় না, শামুকের মত জড়তার খোলার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতে হয়, আপনাকে এমনি মস্তলোক বলিয়া বোধ হয় যে, দাম্ভিক নিরুদ্যমে ফুলিয়া উঠিয়া শীতকালের ভেকটি হইয়া বসিয়া থাকি, আর-কোন লোকের কোন কাজ দেখিলে অত্যন্ত হাসি আসে।

বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি—বিজ্ঞলোকের—কাজের লোকের পক্ষে সে গুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে। যাহারা, কাজ করে না তাহারা আমোদও করে না। ইংরাজেরা কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, আমোদ নহিলেও তাহাদের চলে না। ইংরাজেরা জ্ঞানে বৃদ্ধের মত, কাজে যুবার মত, খেলায় বালকের মত। আসল কথা এই যে, বালকের মত না খেলিলে যুবার মত কাজ করা যায় না, যুবার মত কাজ না করিলে বৃদ্ধের মত জ্ঞান পাকিয়া উঠে না। ক্ষেত্রেই যেমন শস্য পাকিয়া থাকে, গোলাবাড়িতে পাকে না, তেমনি কার্য্যক্ষেত্রেই জ্ঞান পাকিয়া থাকে, জড়তার মধ্যে তাম্রকূটের ধোঁয়ায় পাকিয়া উঠে না। মানুষের মত মানুষ হইতে গেলে বালক বৃদ্ধ যুবা এই তিনই হইতে হয়। কেবলিই বৃদ্ধ হইতে গেলে বিনাশ পাইতে হয়, কেবলিই বালক হইতে গেলে উন্নতি হয় না। আমরা

বাঙ্গালিরা যদি যথার্থ মহৎজাতি হইতে চাই তবে আমরা খেলাও করিব, কাজও করিব, চিন্তা করিব। আমরা প্রফুল্ল হইয়া খেলা করিব উদ্যোগী হইয়া কাজ করিব ও গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিব।

ইংরেজদের "শারাড" নামক এক প্রকার খেলা আছে আমরা বাঙ্গালায় তাহাকে হেঁয়ালি-নাট্য বলিলাম। তাহার মর্ম্মটা বলিয়া দিই। দুই তিন জন লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন একটা কথা বাহির করিতে হইবে যাহা দুই তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ থাকা চাই। মনে কর "পাগোল" শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তার পর উপস্থিতমত মুখে মুখে এক্‌টা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে; সেই নাটকের মধ্যে কোন স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবং গোল শব্দ, এবং পাগল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করিতে হইবে, পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবেন কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল। না বলিতে পারিলে তাঁহাদের হার হইল।

আমরা নিম্নে হেঁয়ালিনাট্যের একটা উদাহরণ দিতেছি। পাঁচজন কিম্বা চারজনে মিলিয়া এই হেঁয়ালি-নাট্য অভিনয় করিবেন, এবং বাকী সকলকে এই নাট্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শব্দটা বাহির করিয়া দিতে হইবে।

প্রথম দৃশ্য।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রবেশ)

হারা। বাবা! ডাক্তার সাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসেরডিম চুরি কর্ত্তে গিয়ে আজ আচ্ছা নাকাল হয়েছি! সাহেব যে রকম তাড়া করে এসেছিল, মরেছিলেম আর কি! ভয়ে পালাতে গিয়ে খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম। পা ভেঙ্গে গেছে, তাতে দুঃখ নেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের। রোগীগুলোকে হাতে পেলে ডাক্তার সাহেব পট্‌পট্ করে মেরে ফেলে, আমার কোন ব্যামস্যাম নেই আমাকেই ত মেরে ফেল্‌বার যো করেছিল। এবারে রোজ রোজ আর হাঁসের ডিম চুরি করব না, একেবারে আস্ত হাঁস চুরি কর্‌ব আমাদের বাড়িতেই ডিম পাড়বে!

নেপথ্য হইতে।—হারু!

হারা। (সভয়ে) ঐরে বাবা এসেছে। আমার এক্‌টা পা খোঁড়া দেখ্‌লে মারের চোটে বাবা আরেকটা পা খোঁড়া করে দেবে!

(নেপথ্যে পুনশ্চ)।—হারু। (নিরুত্তর)। হারা! (নিরুত্তর)। হেরো! (পিতার প্রবেশ)

হারাধন (অগ্রসর হইয়া)। আজ্ঞে!

পিতা। তুই খোঁড়াচ্ছিস্ যে!

(হারাধনের মাথা চুল্‌কন)

পিতা। (সরোষে) পা ভাঙ্গলি কি করে!

হারা। (সভয়ে) আজ্ঞে, আমি ইচ্ছে করে ভাঙ্গি নি!

পিতা। তা ত জানি! কি ক'রে ভাঙ্গ্‌ল সেইটে বল্‌না।

হারা। জানিনে বাবা!

পিতা। তোর পা ভাঙ্গ্‌ল তুই জানিস্‌নেত কি ও-পাড়ার গোব্‌রা তেলি জানে!

হারা। কখন্‌ ভাঙ্গল টের পাইনি বাবা!

পিতা। বটে! এই লাঠির বাড়ি তোর মাথাটা ভাঙ্গলে তবে টের পাবি বুঝি!

হারা। (তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মাথা আড়াল করিয়া) না বাবা! ঐ মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পাটা ভেঙ্গেছি।

পিতা। বুঝেছি। তবে বুঝি সেদিনকার মত ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে হাঁসের ডিম চুরী কর্‌তে গিয়েছিলি তাই তারা মেরে তোর পা ভেঙ্গে দিয়েছে!

হারা। (চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে) হাঁ বাবা! আমার কোন দোষ নেই। পা আমি নিজে ভাঙ্গিনি, পা তারাই ভেঙ্গে দিয়েছে!

পিতা। লক্ষীছাড়া, তোর কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না।

হারা। চৈতন্য কাকে বলে বাবা!

পিতা। চৈতন্য কাকে বলে দেখ্‌বি! (পিঠে কিল মারিয়া) চৈতন্য এ'কে বলে।

হারা। এ ত আমার রোজই হয়।

পিতা। আমি দেখ্‌চি তুমি জেলে গিয়েই মর্‌বে!

হারা। না বাবা রোজ চৈতন্য পেলে ঘরেই মর্‌ব।

পিতা। নাঃ, তোকে আর পেরে উঠিলেম না!

হারা। (চুপ্‌ড়ির দিকে চাহিয়া) বাবা, তাল এনেছ কার জন্যে? আমি খাব।

পিতা। (পৃষ্ঠে কিল মারিয়া) এই খাও!

হারা। (পিঠে হাত বুলাইয়া) এ ত ভাল লাগ্‌ল না!

নেপথ্যে। হারু।

হারা। কি মা!

নেপথ্যে। তোর জন্যে তালের বড়া করে রেখেছি—খাবি আয়!

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রবেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ডাক্তার সাহেবের আস্তাবলে হারাধন হাঁস চুরী করনে প্রবৃত্ত)।

পিতা (দূর হইতে)। হারু!

হারা। ঐ রে, বাবা আস্‌চে, কি করি!

(হারাধনের গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত থলি ঝুলিতেছিল তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাঁস পুরিয়া ফেলিল)।

পিতা। হারু! (নিরুত্তর)। হারা! (নিরুত্তর)। হেরো!

হারা। আজ্ঞে!

পিতা। তোর পেট হঠাৎ অমন ফুলে উঠ্‌ল কি করে?

হারা। বাবা, কাল সেই তালের বড়া খেয়ে।

পিতা। অমন কাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ হচ্চে কেন?

হারা। পেটের ভিতর নাড়িগুলো ডাক্‌চে।

পিতা। দেখি, পেটে হাত দিয়ে দেখি!

হারা। (শশব্যস্তে) ছুঁয়ো না, ছুঁয়োনা, বড্ড ব্যথা হয়েছে! (পেটের মধ্যে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্)

পিতা। (স্বগত) সব বোঝা গেছে। হতভাগাকে জব্দ করতে হবে! (প্রকাশ্যে) তোমার রোগ সহজ নয়। এস বাপু তোমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই!

হারা। না বাবা, এমন আমার মাঝে মাঝে হয় আপনিই সেরে যায়! (ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্)

পিতা। কৈরে, এত ক্রমেই বাড়চে! চল্ আর দেরি নয়!

টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হারাধন। পিতা ও মাতা।

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছার আমার কি হল গা!

পিতা। হাঁগো, তুমি বেশী গোল কোর না। হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেই এ ব্যাম সেরে যাবে।

মা। আমি বেশী গোল করচি না তোমার ছেলের পেট বেশী গোল করচে! (সভয়ে) এবে হাঁসের মত ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে! বাবা, হারু, তোকে আর আমি হাঁসের ডিম খেতে দেব না—তোর পেটের মধ্যে হাঁস ডাক্‌চে—কি হবে! (ক্রন্দন)।

হারু। (তাড়াতাড়ি) না মা, ও হাঁস নয়, ও তালের বড়া! হাঁস তোমাকে কে বল্‌লে! কথ্‌খন হাঁস নয়। হাঁস হতেই পারে না। আচ্ছা, বাজি রাখ' যদি তালের বড়া হয়!

মা। তালের বড়া কি অমন করে ডাকে বাছা!

হারা। তুমি একটু চুপ কর মা। তোমাদের গোলমাল শুনে পেটের ভিতর আরো বেশী করে ডাক্‌চে!

পিতা। বোসেদের বাড়ি আমার একটু কাজ আছে, আমি কাজ সেরেই হারুকে নিয়ে হাঁসপাতালে যাচ্চি।

(প্রস্থান)

(ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্।)

মা। ওগো, এযে ক্রমেই বাড়তে চল্‌ল! ওগো ও মুখুয্যে মশায়!

(মুখুয্যে মশায়ের প্রবেশ)

মুখু। কি গো বাছা!

মা। বাছার আমার ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌ল। একে শীগগির—ঐ যে কি বলে ঐ—তোমাদের হাঁচ্‌পাতালে নিয়ে চল।

মুখু। আমি ত তাই প্রথম থেকেই বল্‌চি, হারুর বাবাই ত এতক্ষণ দেরী করিয়ে রাখ্‌লে। (হারার প্রতি) তবে চল্, ওঠ!

হারা। না দাদা মশায়, আমি হাঁসপাতালে যাব না, আমার কিছু হয় নি!

মুখু। কিছু হয় নি বটে! তোর পেটের ডাকের চোটে পাড়াসুদ্ধ অস্থির হয়ে উঠল! পেটের মধ্যে বাতশ্লেষ্মা পিত্ত তিনটেতে মিলে যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে!

বলপূর্ব্বক লইয়া যাওন।

চতুর্থ দৃশ্য।

হাঁসপাতালে ডাক্তার সাহেব ও হারাধন।

ডাক্তার। টোমার পেটে কি হইয়াছে!

হারা। কিছু হয় নি সাহেব। এবার আমাকে মাপ কর সাহেব, আমার কিছু হয় নি!

ডাক্তার। কিছু হয়নি ট এ কি! (পেটে খোঁচা দেওন ও দ্বিগুণ ক্যাক্ ক্যাক্ শব্দ) (হাসিয়া) টোমার ব্যাম আমি সমষ্ট বুঝিয়াছি।

হারা। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি সাহেব আমার কোন ব্যাম হয় নি। এমন কাজ আর কখন করব না!

ডা। টোমার ভয়ানক ব্যাম হইয়াছে।

হারা। সাহেব, আমার ব্যাম আমি জানিনে তুমি জান! (কঁ্যাক কঁ্যাক্। সরোষে থলিতে চাপড় মারিয়া) আমোলো যা, এর যে ডাক কিছুতেই থামে না!

ডাক্তার। (বৃহৎ ছুরী লইয়া) টোমার চুরী-ব্যাম হইয়াছে, ছুরি না ডিলে সারিবে না! (পেট চিরিতে উদ্যত)।

হারা। (কাঁদিয়া হাঁস বাহির করিয়া) সাহেব, এই নাও তোমার হাঁস। তোমার এ হাঁস কোন মতেই আমার পেটে সইল না। এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভাল!

(হারাকে ধরিয়া সাহেবের প্রহার।)

হা। সায়েব, আর আবশ্যক নেই, আমার ব্যানো একেবারেই সেরে গেছে!

সমাপ্ত।

এই ত আমার হেঁয়ালি নাট্য ফুরাইল। এবার প্রথম বলিয়া খুব সহজ করিয়া দিয়াছি। কথাটা কি, আন্দাজ করিয়া বল দেখি?

গান অভ্যাস।

গমক, গিট্‌কারি, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি সঙ্গীতের অলঙ্কার। স্বর কম্পনের নাম গমক। কতকগুলি স্বরের মধ্যদিয়া দ্রুতগমন করাকে গিট্‌কারি কহে। স্বরগুলির মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ না হইয়া এক স্বর হইতে আর এক স্বরে একেবারে গড়াইয়া যাওয়াকে মূর্চ্ছনা বলে। এই কয়েকটী অলঙ্কার ব্যতীত আরও অনেক অলঙ্কার আছে কিন্তু তাহা এখন বলিবার তত প্রয়োজন নাই এক্ষণে নিম্নের গান দুইটী শিখিতে গেলে যা যা শিক্ষা করা আবশ্যক তাহাই বুঝাইয়া দিতেছি। সঙ্গীত অধিক মিষ্ট শোনাইবার জন্য গমক গিট্‌কারী প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়। আমরা গতবারের "বালকে" যে গানটী লিখিয়াছিলাম তাহাতে কিছুমাত্র অলঙ্কারাদি দেওয়া হয় নাই কেননা প্রথমেই ঐ সকল অলঙ্কারাদি গানেতে প্রয়োগ করিলে গানটী গাওয়া কিম্বা বাজানো পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে অত্যন্ত শক্ত হইত। গানে যাহা যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকদের অল্পে অল্পে অভ্যাস করাইলে গান শিক্ষা করিতে তাঁহাদের অধিক বিরক্ত বোধ হইবে না। প্রত্যেক বারে যে সকল নূতন নূতন গান লিখিত হইবে সেই সকল নূতন গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে যদি পূর্ব্বপ্রদত্ত নিয়মের অতিরিক্ত কিছু লাগে তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত নিয়মগুলি বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। এবারে আমরা দুইটী গান লিখিয়া

দিতেছি। তন্মধ্যে বঙ্কিমবাবুর রচিত "বন্দে মাতরং" নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটা দেওয়া গেল না, কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত হইবে না। বন্দে মাতরং গানে বিস্তর অলঙ্কার লাগিয়াছে। "ভাসিয়ে দে তরী" নামক গানটীকে সহজাবস্থার রাখা হইয়াছে। তাহা দুই এক প্রবন্ধ পরে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন। বন্দে মাতরং গানটী বাজাইতে গেলেই দেখিবেন্ যে মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় তিনটী চারিটী সুর এক একটী বন্ধনী চিহ্নের (Bracket) ভিতর পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে তিনটী চারিটী সুর কেবল এক মাত্রা অধিকার করিয়া থাকাতে ঐ সুরগুলিকে (Bracket) বন্ধনী চিহ্নের ভিতর দিয়া তাহাতে এক মাত্রার চিহ্ন দেওয়া গেল। যখন গানের সুর লিখিতে হয় তখন মূৰ্চ্ছনা গমক প্রভৃতির প্রত্যেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলি ধরিয়া লিখিতে হয় কিন্তু গাহিবার সময় ঐ সূক্ষ্ম সুরগুলি পরস্পরের সহিত যোগ না রাখিয়া প্রত্যেক সুরটী যদি পৃথক পৃথক করিয়া গাওয়া হয় তাহা হইলে গানটী অতি "খটখটে" শুনিতে বোধ হয় ও নীরস হইয়া পড়ে। গান-গাহিবার সময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরগুলিন অবিচ্ছেদে তরঙ্গের ন্যায় মিশাইয়া গান করিলে মিষ্ট শোনায়। পিয়ানোতে হাজার তাড়াতাড়ি করিয়া মিশাইয়া বাজাইলেও পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম সুরগুলিকে গলাতে কখন পৃথক পৃথক রূপে বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন্ না। যাহাতে সুরগুলি গড়াইয়া মিশাইয়া যায় সেইরূপ অভ্যাস্ করা কৰ্ত্তব্য। যদি কোন জায়গায় পাঠকদের কাহারও কিছু বুঝিতে গোল থাকে তাহা হইলে আমাদের লিখিলেই আমরা সাধ্যমত বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

এবারে যে দুইটী গান প্রকাশ করা হইতেছে উহাদের তাল কাওয়ালি। কাওয়ালি তালে চারিটী করিয়া তাল থাকে এবং প্রত্যেক তাল চারিটী করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। লিখিত গানে যেখানে একমাত্রার চিহ্নের পর অৰ্দ্ধমাত্রার চিহ্ন থাকিবে, সেখানে দেড়মাত্রা বুঝিতে হইবে। "বন্দে মাতরং" গানের যে অংশটুকুর সুর লেখা হইয়াছে সেই অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বন্দে মাতরং।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

বন্দে মাতরং

BY HURISH CHUNDER HALDER.

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

সাঁ— —সাঁ— —। নী—(সাঁ রেঁ সাঁ)—নি—০ধা০। পা— —ধা০পা০ম০গা০। রে— — — —॥
ব ন্দে মা ত রম্

ম—রে—ম— —। পা— —ধা— —। নি—সাঁ—(নি সাঁ রেঁ)—০সাঁ০। (সাঁ রেঁ সাঁ)—
মা ত রম্

নি—(ধা পা ম)—পা—॥ সাঁ— —সাঁ— —। নী—(সাঁ রেঁ সাঁ)—নি—০ধা০। পা— —
বন্ দে এ মা

ধা০পা০ম০গা০। রে— — — —॥ রে—ম—ম—০গা০। রে—গা—সা— —।
ত রম্ সু জ লাং সু ফ লাং

রে—রে—ম—ম—। পা—পা—পা— —॥ ম— —পা— —। নী—নী—সাঁ— —।
ম ল য় জ শী ত লাং শ স্য শ্যা ম লাং

সাঁ—নী—রেঁ—সাঁ—। (সাঁ রেঁ সাঁ)—নি—(ধা পা ম)—পা—॥ সাঁ— —সাঁ—রেঁ—।
মা ত রম্ বন্ দে

সাঁ—নি—ধা—পা—। রে—গা—ম—গা—। রে— — — —॥ ম— —পা— —।
মা ত রম্ শু ভ্র

নী— —ধা০নী০সাঁ০রেঁ০। রেঁ—সাঁ—সাঁ—সাঁ—। সাঁ—সাঁ—সাঁ— —॥ নী— —
জ্যোৎ স্না পু ল কি ত যা মি নীং ফু

নী—নী—। সাঁ—সাঁ—সাঁ— —। পা—নী—সাঁ—সাঁ—। নী০সাঁ০রেঁ০সাঁ০রেঁ— —॥
ল্ল কু সু মি ত দ্রু ম দ ল শো ভি নীং

সাঁ—নি— —ধা—। নি— —ধা—নি—। নি—রেঁ—সাঁ—নি—। নি—ধা—পা— —॥
সু হা সি নীং সু ম ধু র ভা ষি নীং

পা—নি— —ধা—। নি— —ধা—নি—। নি—রেঁ—সাঁ—নি—। নি—ধা—পা— —॥
সু হা সি নীং সু ম ধু র ভা ষি নীং

পা—নী—সাঁ— —। গা—ম—পা—সাঁ—। নী—সাঁ০রেঁ০সাঁ—নি০ধা০। পা—ধা০পা০ম—
সু খ দাং ব র দাং মা ত রম্

পা—॥ সাঁ— — — —। নী০সাঁ০রেঁ০সাঁ০নী০ধা০পা—। রে০গা০ম০পা০ধা০পা০ম০গা০।
বন্ দে মা ত

রে— — — —॥
রম্

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আশ্চর্য্য পলায়ন।

কিয়েফের প্রধান কারাগারে আমাদের রাখিয়া দিল। আমাদের দোষের এক এক খানি তালিকা আমাদিগকে দিল—বিদ্রোহিতা, গুপ্ত নৈতিক সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া, পুলিষকে বাধা দেওয়া—এই সমস্ত দোষে আমরা দোষী। আমরা সর্ব্বসমেত চৌদ্দজন বন্দী, আটজন পুরুষ, ছয়জন স্ত্রীলোক। চারি দিন ধরিয়া আমাদের বিচার চলিতে লাগিল। সে বিচার, বিচার নামেরই যোগ্য নহে। তিনজনের ফাঁসির এবং অবশিষ্ট লোকের কারাবাসের আজ্ঞা হইল। আমরা কে কি শাস্তি পাইব তাহা জানিবার পর হইতে আমাদের কষ্ট কিছু কমিল। আগে আমাদের প্রত্যেককে একেবারে একেলা থাকিতে হইত এখন জেলের বাগানে একত্রে বেড়াইবার অনুমতি পাইলাম। একত্রে বেড়াইবার সুখ আমরা সমস্ত প্রাণের সহিত উপভোগ করিতাম আর তাহাতে আমরা কত যে সান্ত্বনা পাইতাম তাহা বলা যায় না। দণ্ডাজ্ঞার দুই সপ্তাহ পরে একদিন কারারক্ষকদিগের ভাব ভঙ্গী ও অন্যান্য চিহ্ন দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, যাঁহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে কালই তাঁহাদের ফাঁসি হইবে। যাঁহারা ফাঁসি যাইবেন তাঁহারাও তাহা বুঝিতে পারিলেন। যদিও আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম যাহাতে আমাদের মুখে শান্তভাব ছাড়া আর কিছু প্রকাশ না পায় তবুও সে দিন সন্ধ্যাবেলাকার বিদায় বড় হৃদয়বিদারক হইল। অন্যান্যবারে ভোরের বেলা ফাঁসি দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এবার মহা সমারোহে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ফাঁসি হইল। তিনটি বন্দীর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য চলিল। আমাদের বন্ধুদের দেহ যখন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিল অমনি সৈনিকেরা তাহাদের ব্যাণ্ডে উল্লাস প্রকাশক একটা সুর বাজাইয়া উঠিল, যেন কি এক মহা যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে।

ফাঁসির পর হইতে সাইবিরিয়ায় যাত্রা পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। আমাদের কাহার কোথায় যাইতে হইবে সেই সম্বন্ধে প্রতিদিন নূতন নূতন গুজব শুনিতে পাইতাম আর আমরাও তাহাই লইয়া আন্দোলন করিতাম। দুই সপ্তাহ পরে একদিন শুনিলাম যে, এখনিই যাত্রা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। আমাদের মত কয়জন উচ্চবংশজাত লোককে কেবল মাত্র বন্দীর কাপড় পরাইয়া দিল, অন্যদের মস্তক মুণ্ডন, পায়ে বেড়ি পর্য্যন্ত হইল। যাহাদের কেবল মাত্র নির্ব্বাসন তাহাদের কাপড়ে একটা করিয়া হলদে রংগের চিহ্ন, যাহাদের কঠিন পরিশ্রমের সহিত নির্ব্বাসন তাহাদের কাপড়ে ঐরূপ দুইটা চিহ্ন। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতে হইবে তাহা কি জানিতে পাইব না ?" জেনেরাল গুবার্ণে উত্তর দিলেন "পূর্ব্ব সাইবিরিয়ায়।" তখনি বুঝিলাম আমার অদৃষ্টে কি আছে—

চৌদ্দ বৎসর কঠিন পরিশ্রম—হয়ত এমন এক প্রদেশে থাকিতে হইবে যেখানে রাত্রি প্রায় কখনই পোহায় না, যেথানে মেরু দেশের ন্যায় তীব্র শীত।

ট্রেনে করিয়া নিজ্নি নভগরদ পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে জল পথে গর্মে পৌছিলাম। এখানে আসিয়া মনে হইতে লাগিল যে যথার্থই সাইবিরিয়ায় যাইতেছি। আমরা এক এক খানা ছোট তিন ঘোড়ার গাড়ি করিয়া যাইতে লাগিলাম, প্রত্যেক বন্দীর সম্মুখে একজন ও পার্শ্বে একজন করিয়া সৈনিক পুরুষ। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অসীম আকাশ, পথের দুই পার্শ্বে সুদূর দিগন্তব্যাপী নিবিড় বন ও পর্ব্বত শ্রেণী। যাহাদের দৃষ্টি কত মাস হয়ত কত বৎসর ধরিয়া কেবল কারাগারের চারি দেয়ালের মধ্যে বদ্ধ ছিল প্রকৃতির এই মহান, অসীম দৃশ্য দেখিয়া ও স্বর্গীয় মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া তাহাদের মনে যে কি রূপ ভাবের উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা যে স্বাধীনতার জন্যে লালায়িত এখানে যেন সেই স্বাধীনতা মূর্ত্তিমতী হইয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন।

আমরা দিনরাত চলিতে লাগিলাম। এক দিন দ্বিপ্রহর রাত্রে ঘোড়া বদল হইল, তাহার কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমার রক্ষকেরা নিদ্রায় অভিভূত। তাহারা কিছুক্ষণ ধরিয়া ঢুলিতেছে আর এক একবার মাথাঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। চিন্তায় আমার ঘুম নাই, কিন্তু আমার মনে একটা ফন্দি উদয় হইল, আমিও ঢুলিতে ও নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলাম। আমার কৌশল খাটিল। কিছুক্ষণ বাদে রক্ষকদের এমনিই নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল যে তাহাতে মৃতও জাগিয়া উঠে। সম্মুখস্থিত রক্ষক দুই হাত ও দুই পা দিয়া তাহার বন্দুক জড়াইয়া একবার সাম্নে একবার পিছনে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল আর মাঝে মাঝে হেঁড়ে গলায় অস্পষ্ট বকিতে লাগিল। সে এখন স্বপ্ন রাজ্যের গভীর প্রদেশে। আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া চারিদিকে চাহিলাম। নির্ম্মল আকাশে কোটি কোটি তারকা জ্বল জ্বল করিতেছে, তখন আমরা একটা নিবিড় বন মধ্য দিয়া চলিতেছি। একটি লাফ দিলেই ঐ বনমধ্যে যাইতে পারি। আর, একবার ঐ বন মধ্যে যাইয়া পড়িতে পারিলে আমাকে ধরা পলাতক বাঘকে ধরার মত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে, কেননা আমি অতি দ্রুত দৌড়িতে সক্ষম এবং স্বাধীনতার জন্যে ব্যগ্র। কিন্তু এই বন্দীর সাজ লইয়া কয়দিনই বা আমার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব? রুসিয়ায় পৌছিতে গেলে রাজপথ দিয়া যাইতে হইবে, যে সৈনিকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবে সেই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। আবার আমার মাথায় টুপি নাই তাহাতেও ধরাপড়িবার সম্ভাবনা আছে। আমার কোন অস্ত্র নাই সেইটি আরও খারাপ। বন্য পশুদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষণে সক্ষম হইব না এবং শিকারও মারিতে পারিব না; বনে বনে পালাইতে হইলে শিকার ব্যতীত আর কোন খাদ্য পাইব না।

না, এ সঙ্কল্প এখন ত্যাগ করিতেই হইল, অন্য একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা যাক্। যখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম হঠাৎ—দিব্য-জ্ঞানের ন্যায় আমার মনে আসিল যে রক্ষকের হাতে বন্দুক আর মাথায় টুপিও আছে। তাই নিই না কেন? সে এখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তার নাকের ডাক বরং আরও বাড়িয়াছে। এমন সুযোগ আর কখন হইবে না। তাইই করি, আর দু মিনিট পরেই স্বাধীনতা!

আমার আনন্দোচ্ছ্বাস ছুটিয়া বাহিরিতে উদ্যত। রুদ্ধশ্বাসে, দ্রুতগামী হৃদয়বেগ চাপিয়া গুঁড়ি মারিতে মারিতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিকটে গেলাম, আস্তে টুপিটির উপরে হাত রাখিলাম—সে কিছুই করিল না, পরক্ষণেই টুপিটি আমার কাপড়ের ভিতরে স্থান পাইল। এখন বন্দুকটা। একবার ধরিয়া টানিবার চেষ্টা পাইলাম—সহজে আসে না আবার টানিলাম—তৃতীয়বার টানিবার উদ্যোগে আছি এমন সময়ে হঠাৎ নাসিকা-ধ্বনি বন্ধ হইল। দ্রুতগতিতে স্বস্থানে আসিলাম, ঘুমের ভান করিয়া গভীর নিশ্বাস টানিতে লাগিলাম। রক্ষক জাগিয়া উঠিল, বিড় বিড় করিয়া খানিকটা বকিল, মাথায় হাত বুলাইয়া চারিদিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম

"ওহে ভাই, তোমার টুপি হারাইয়াছে নাকি?"

সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল "তাইতো টুপিটা দেখিতে ছিনা মশায়।"

"দেখিলে ভাই রাস্তায় ঘুমান কি বিপদ! মনে কর আমি যদি ইতিমধ্যে গাড়ি হইতে সরিয়া পড়িতাম। এখান হইতে পলায়ন করা বড় যে শক্ত ব্যাপার তাহা নহে।

আচ্ছা ভাই, এই লও তোমার টুপি, তোমাকে একটু ভয় দেখাইবার জন্যে আমি এটা লুকাইয়াছিলাম।"

সে বেচারা অতি করুণভাবে আমাকে ধন্যবাদ দিল, টুপির জন্যে যত হউক বা না হউক না পালাইবার দরুণ সে ব্যক্তি বড়ই কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। এই সময়ে আমরা একটা আড্ডায় পৌঁছিলাম।

এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, আমাদিগকে অন্যান্য শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীদের সহিত ইর্কুট্স্ক পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। এইখানে আমি একটা উপায় স্থির করিলাম। সাইবিরিয়ার বন্দীরা আপনাদের মধ্যে এক প্রকার বদ্‌লাবদ্‌লি করিয়া থাকে। মনে কর একজন ধনী বন্দীর গুরুতর দণ্ড হইয়াছে, তিনি একজন দরিদ্র বন্দীকে কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া তাহার নাম গ্রহণ করিলেন সেও ধনীর নাম গ্রহণ করিল। এইরূপ উপায়ে ধনী বন্দীর দণ্ডের লাঘব হয়। আমিও সেই উপায় গ্রহণ করিব, মনে করিলাম।

ইর্কুট্স্কে পৌঁছিবার চোদ্দদিন বাকি থাকিতে আমার বদ্‌লাবদ্‌লির কার্য্যটি সম্পন্ন হইল। আরও অনেকে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। বন্দীদের মধ্যে এ ব্যাপার

গোপন থাকিত না আর গোপন রাখিবার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা যতদিন একত্রে থাকিবে ততদিন সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেই হইবে। কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সঙ্গীরা তখনি তাহাকে মারিয়া ফেলিবে তাহা সকলেই জানিত। পাভ্‌লভ্, যিনি আমার স্থানভুক্ত হইলেন তাঁহার চাষার ঘরে জন্ম, ডাকাতি ব্যবসা, তিনি বার টাকা, এক যোড়া বুট, একটা ফ্লানেলের কাপড় লইয়া বদ্‌লি হইতে স্বীকার পাইলেন। একটা বড় আড্ডায় পৌছিবার দুইদিন পূর্ব্বে এই প্রকার ভান করিলাম যেন আমার দাঁতে ব্যথা হইয়াছে, মুখে রুমাল বাঁধিয়া রাখিলাম, সুযোগ পাইলেই শুইয়া পড়িতাম আর দেখা-ইতাম যেন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছি। আমার বদ্‌লিকে বলিয়া রাখিলাম যে, আড্ডায় পৌছিলেই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা গোপনীয় স্থানে যাইবে। এই কৌশল চমৎকার রকমে খাটিয়া গেল। দুই দিন অন্তর রক্ষকদল বদল হয়, এইটুকু সময়ের মধ্যে প্রত্যেক বন্দীর চেহারা চিনিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। এই জন্যে সংখ্যা ঠিক থাকিলেই তাহারা অব্যাহতি পায়। আমাদের দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্বসমেত ১৭০ জন। সন্ধ্যার সময় এক একটা আড্ডায় পৌছিতাম। আড্ডার দ্বারে একবার গণনা করা হইত, সংখ্যা ঠিক থাকিলে দ্বার খুলিয়া দিত, অমনি উল্লাস-সূচক এক চিৎকার ধ্বনি করিয়া শ্রান্তক্লান্ত বন্দীরা তাড়াতাড়ি ঠেলাঠেলি করিয়া আড্ডায় প্রবেশ করিত। ঘরের ভিতরে শৃঙ্খলের ঝনঝনি, অশ্রাব্য কথা, আর ভাল স্থান অধিকার করিবার জন্যে মারামারি বাধিয়া যাইত। যাহারা আগে ঘরে যাইতে পারিত তাহারা বেঞ্চগুলি দখল করিয়া বসিত, বেঞ্চ না পাইলে বেঞ্চের নীচে শুইয়া পড়িত কেননা সে স্থানটা অপেক্ষাকৃত কিছু পরিস্কার।

আড্ডায় পৌছিয়া মিনিট কতকের মধ্যে আমরা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইলাম; আমাদের চেহারাতে কিছুই ঐক্য ছিল না কিন্তু লম্বাচৌড়ায় আমরা সমান ছিলাম এই জন্যে দূর হইতে একজনকে আর একজন বলিয়া ভুল হওয়া আশ্চর্য্য ছিল না। আমরা নির্ব্বিঘ্নে নূতন একজন রক্ষকের হস্তে অর্পিত হইলাম। পাভলভ্ মুখে রুমাল বাঁধিয়া একটা বেঞ্চে পড়িয়া রহিল। যখন পুরাতন রক্ষকেরা বিদায় লইল তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কি করিয়া এমন সহজে রক্ষকদিগের চক্ষে ধূলা দিতে পারিলাম এখন ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বিদ্বান ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া আমার একটা খ্যাতি ছিল তাহা সকলেই জানিত, এদিকে পাভলভ্ একেবারে নিরেট মূর্খ, সে কথা কহিলেই তাহার কুলের পরিচয় পাইতে বাকি থাকে না। এক দিবস একজন সেনাপতির পাড়া হওয়াতে তিনি বন্দীদের তালিকায় আমার ডাক্তারি বিদ্যার পরিচয় পাইয়া পাভ্‌লভের নিকটে গেলেন, পাভ্‌লভ্ তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্যাকাচ্যাকা না খাইয়া অতি সহজ ভাবে তাহার যাহা মুখে আসিল তাহাই তাঁকে বলিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাহাকে কেহ ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতে বলে নাই। বদলের পর আমি শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া ইতর

বন্দীদের সহিত পদব্রজে চলিতে লাগিলাম, আমার দিন দুই পয়সা বরাদ্দ হইল। পাভ্লভ্ দিন তিন পয়সা করিয়া পাইতে লাগিল আর শ্রান্তি বোধ হইলে গাড়ি চড়িতে পাইত। রাত্রি আটটার সময় ইরকুট্স্কে পৌছিলাম। তথাকার প্রধান কারাগারে আমাদের লইয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষীয় এক ব্যক্তি আমাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক করিয়া ডাকিয়া নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার পালা আসিল। "পাভ্লভ্!" বলিয়া ডাক পড়িল।

আমি উত্তর দিলাম "আজ্ঞে।"

"পল্ পাভ্লভ্?" এই বলিয়া আমাকে একবার খুব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন।

আমি চাষার মত ভাব দেখাইতে ও চাষার মত করিয়া কথা কহিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বলিলাম "হাঁ হুজুর"।

"কি দোষের জন্যে তোমার বিচার হইয়াছিল?"

"ডাকাইতির জন্যে হুজুর"।

"গবর্ণমেণ্ট তোমাকে যাহা দিয়াছেন সমস্তই ঠিক আছে?"

"সবই আছে হুজুর"।

"দুইটা জামা, দুইটা ইজার, একযোড়া বুট, পায়ের বেড়ি?" একজন তাড়াতাড়ি এই-গুলি আওড়াইয়া গেলেন। প্রত্যেক জিনিসের নামের পরে আমি বলিলাম "হাঁ আছে।"

আমার পায়ের বেড়ি খুলিয়া দিলাম।

তাহার পাঁচদিন পরে আমাদের দলের কতকজন আরও পূর্ব্বে প্রেরিত হইল। দল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে দলস্থ ব্যক্তিদিগের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধও চলিয়া গেল, ইহাতেই পরে আমার ফন্দি ফাঁস হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের রক্ষকেরা চলিয়া গেল। আমরা একটা গ্রামে গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম।

মুখ চেনা।

কপাল সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম বলিয়া কপালের কথাটা শেষ করা যাক্। যার কপাল যত গড়ানে, তার চিন্তাশক্তি—বিবেচনা-শক্তি সেই পরিমাণে কম। তারা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে।

১ চিত্রের সারি সারি মুখগুলি দেখিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারিবে।

চোখ্।

এখন চোখ্ ও ভুরুর কথা বলা যাক্। সমস্ত মুখাবয়বের মধ্যে চোখে যেমন ভাব প্রকাশ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এক জন কবি বলিয়াছেন, চোখ্ হচ্চে "আত্মার
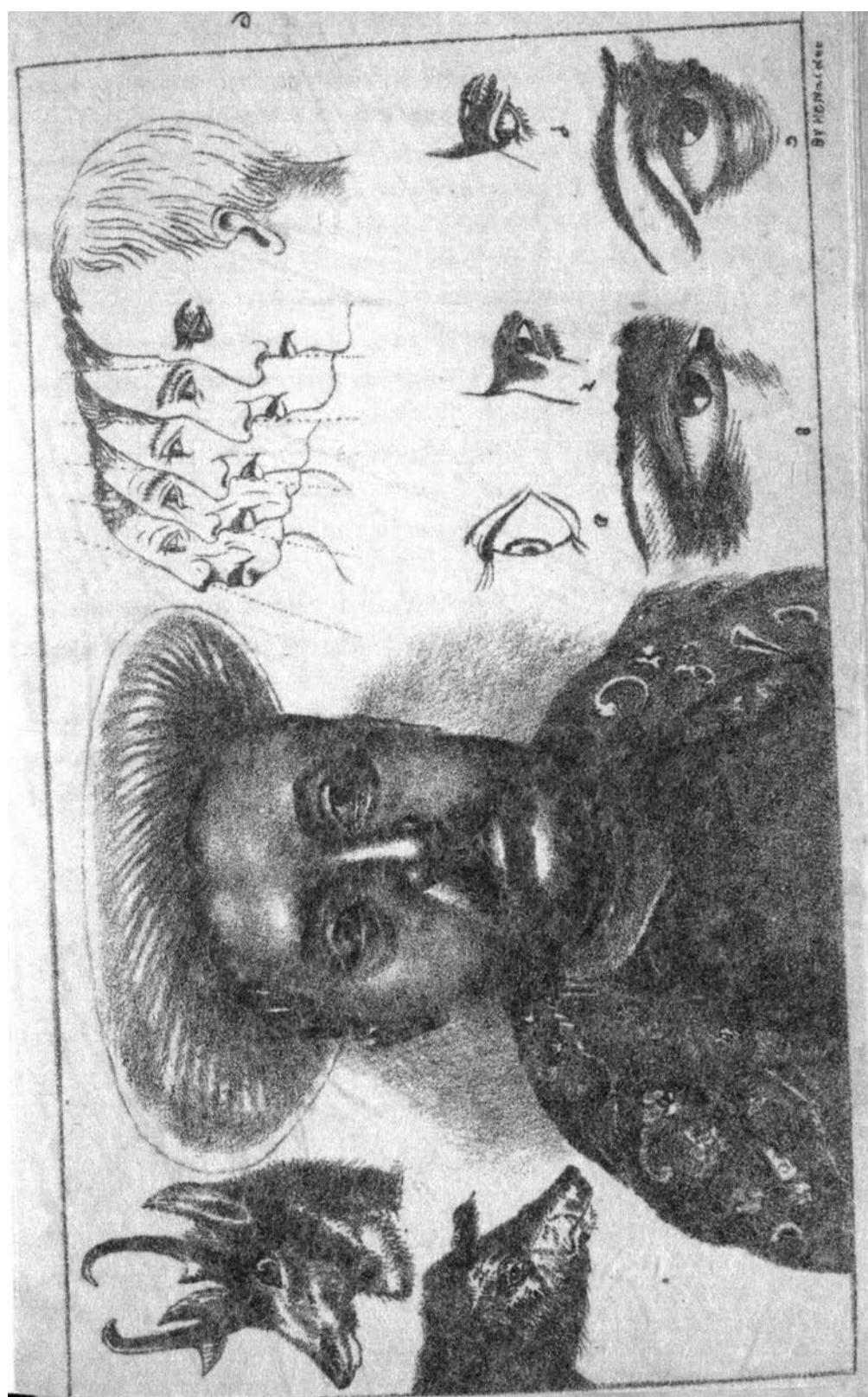
গবাক্ষ"। এ কথা খুব ঠিক্। ছবি আঁকিবার সময় দেখা যায়—একটু আধটু চোখের রেখার ইতর বিশেষে মুখের ভাব কতটা বদ্‌লিয়া যায়। আমাদের দেশের কবিরা আমাদের সুন্দরীদিগের নেত্র হরিণ নেত্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কারণ হরিণের ড্যাবা ড্যাবা চোখে চকিত ভয়ের ভাব সুন্দর প্রকাশ পায়। লজ্জা ভয় আমাদের স্ত্রী সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ বলিয়া এই উপমাটি ঠিক খাটিয়াছে। চোখ্ দেখিবার সময়, প্রথমে দেখা উচিত, চোখ ছোট কি বড়। শরীরতত্ত্বের এই একটি সাধারণ নিয়ম, যার যত বড় চোখ্, তার সেই পরিমাণে দৃষ্টিশক্তি অধিক। এই জন্য হরিণ, কাঠবিড়ালী, খর্গস, বিড়াল ইহাদের চোখ্ বড়; আর, শূয়োর, গাণ্ডার প্রভৃতির চোখ্ ছোট এবং তাহাদের দৃষ্টিশক্তি কম। হরিণ ও শূকরের ছবি দেখ। হরিণের চোখ কত বড়, আর শূয়োরের চোখ কত ছোট। যেমন শরীরতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে চোখের আয়তনের উপর দৃষ্টিশক্তির তারতম্য নির্ভর করে, তেমনি মুখ-চেনা বিদ্যার মতে চোখে বুদ্ধিবৃত্তির উজ্জলতা, তীক্ষ্নতা প্রভৃতি প্রকাশ যায়—বিশেষতঃ সামাজিক ভাবের—ধর্ম্মভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যাহাদিগের বড় চোখ্ তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যেন তাহারা খুব "জাগ্রত জীবন্ত" এবং কার্য্যের জন্য সদাই উন্মুখ। আর যাদের ছোট চোখ তাদের দেখিলে মনে হয় যেন তাদের শরীর মনে কেমন একটা জড়তা অলসতা ও ঘুমন্ত ভাব আছে। ডাক্তার রেড্‌ফীল্ড বলেন যে, যাহাদের চোখ্ বড় তাদের চঞ্চল হৃদয়ে ভাব লহরী খেলিতে থাকে, তাদের চিন্তাক্রিয়া খুব দ্রুত, আর তারা খুব তড়বড় করিয়া কথা কহে। আর যাদের ছোট চোখ্ তাদের ভাব ইহার বিপরীত। যাদের বড় চোখ্ তারা একটু সাদাসিদে খোলা রকমের লোক—তাদের মনের ভাব কথায় স্বতই প্রকাশ হয়, আর, যাদের চোখ ছোট তারা ভাবিতে দেরি করে ও সাত পাঁচ ভাবিয়া একটি কথা কহে—ও তাহারা স্বভাবতঃ একটু কুটীল।

চোখে ভাষাশক্তি প্রকাশ পায়। যাদের চোখ্ বাহির দিকে ও নীচের দিকে বের-করা—ফুলো-ফুলো ও বড় তাদের ভাষাশক্তি বিলক্ষণ আছে—কথার উপর তাদের খুব দখল—তারা উপস্থিত বক্তা ও দ্রুত লেখক। বের-করা চোখে চারিদিককার বহির্বস্তুর ছবি সহজে পড়ে। যাদের এই প্রকার চোখ তারা একদৃষ্টিতে সাধারণভাবে সমস্ত পদার্থ দেখিয়া লইতে পারে—কিন্তু তাহারা প্রত্যেক বস্তু তেমন খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে পারে না, যাদের চোখ ভিতরে ঢোকা তারা যাহা দেখে তাহা খুব ঠিক করিয়া দেখে—খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। কিন্তু তারা তেমন চট্ করিয়া ভাবগ্রহ করিতে পারে না। ফুলো চোখ্ ও কোটরে চোখের এই প্রভেদ। ১ ও ২ সংখ্যক চিত্র দেখ, সুবক্তা মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ছবিটি দেখ—ইহাঁর চোখের নীচের পাতা কেমন ফুলো—ইহাতেই ইহাঁর ভাষা-শক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

সুন্দর চোখ্‌গুলি প্রায় লম্বাদিকে খোলা—চওড়াদিকে ততটা খোলা নয়। চোখের উপরের পাতা ও নীচের পাতা চওড়া ভাবে বিস্তৃত হলে—চোখ্‌টাকে কেমন গোল দেখায়। যেমন বিড়ালের চোখ্‌ কিম্বা পেঁচার চোখ্‌। তাহারা অল্প আলোয় অনেক দেখিতে পায় ও সহজে বহির্বস্তুর ভাবগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এই ভাব সকল তেমন স্পষ্ট ও ঠিক হয় না—আর, যাদের চোখের পাতা চোখের উপর পড়িয়া চোখ্‌কে একটু ঢাকিয়া রাখে, তারা যদিও বহির্বস্তুর ততটা শীঘ্র ভাবগ্রহ করিতে পারে না কিন্তু তাহারা যে ভাবগ্রহ করে তাহা বেশি ঠিক ও স্পষ্ট হয়। গোল-চোখো লোকেরা অনেক দেখে কিন্তু কম ভাবে। আর যাদের চোখ্‌ দীর্ঘায়ত তারা বেশি ভাবে ও বেশি তীব্ররূপে অনুভব করে। ৩ ও ৪ সংখ্যক চিত্র দেখ, যাদের বড় বড় গোল চোখ্‌ তারা আমুদে, বুদ্ধিমান—উজ্জ্বল ভাবাপন্ন—খোলা—ও তাদের মন উচুদরের। কিন্তু দীর্ঘায়ত কিম্বা প্রশস্ত চক্ষু লোকদিগের ন্যায় তাহাদের তেমন গভীরতা, বা উদ্ভাবনা শক্তি নাই।

যাদের চোখ্‌ পিট্‌পিটে, মিট্‌মিটে তারা ভারি ধূর্ত্ত।

যাদের চোখ্‌ পটল-চেরা ও টানা তারা খুব মমতাময় ও সৌখীন। যাদের চোখের উপরের পাতা বড় ও চোখ্‌ও একটু দীর্ঘায়ত তাদের চোখে কেমন এক প্রকার ঢুলু-ঢুলু স্নিগ্ধ ভাব প্রকাশ পায়।

যাদের চোখের তারা সমস্তটাই দেখা যায়—তারার উপরে ও নিচে সাদা বেরিয়ে থাকে, তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির, রাগী ও অবিবেচক। ৫ সংখ্যক চিত্র দেখ। লাবেটার বলেন,

“রস-কস্‌-হীন একটা সামান্য মুখে যদি খোলা প্রশস্ত, ও বাহিরে বেরকরা চোখ থাকে তবে তাহাতে এই সূচিত হয় যে সেই লোকের দৃঢ়তা অপেক্ষা একগুঁয়েমি বেশি—সে অত্যন্ত ভোঁতা ও নির্বুদ্ধি—কিন্তু বিজ্ঞতার ভান করে—আসলে হৃদয়-হীন কিন্তু আপনাকে হৃদয়বান বলিয়া লোকের কাছে জানাইতে ইচ্ছা করে। এক এক সময়ে হঠাৎ তাহার ভাবের তীব্রতা হয়—কিন্তু উহা হৃদয়ের স্থায়ী স্বাভাবিক ভাব নহে।”

চোখের স্থায়ী সাধারণ ভাব প্রকাশক চিহ্ন সম্বন্ধে মোটামুটি দুই চারিটা কথা বলা গেল। তার পর হাসি কান্না, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চোখের ভাবের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিলে বাহুল্য হইয়া পড়িবে। তাই আপাতত ক্ষান্ত হওয়া গেল। ভুরুর যোগে চোখের ভাব কি প্রকার হয় তাহা আগামী বারে ব্যাখ্যা করা যাইবে।

সম্পাদকের নিবেদন।

"লাঠির পরে লাঠি" লেখক আমারিই লাঠি ঘুরাইয়া আমাকেই বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার লাঠি খেলার চমৎকার কৌশল, তাঁহার বাক্য বিন্যাসের ঘটা, তাঁহার রসিকতার ছটা আমাদের মুখ হইতে বারম্বার বাহবা বাহির করিয়াছে। আমাদের দেশের দরিদ্র বালকদের অবস্থাদি সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর করিয়া তিনি আমার পরম ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আর "স্কুল পালানে ছেলেরাই কবি হয়" সুকবি হইবার এই সুন্দর সঙ্কেতটি বলিয়া দিয়া তিনি জগৎশুদ্ধ লোককে উপকৃত করিয়াছেন। লেখক আমাদের আধুনিক অবস্থার যে জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন আমি কিম্বা আর কেহ যে তাহার কোন অংশ সংশোধন করিয়া দিতে পারে এমন বোধ হয়না। তবে কিনা আমার জ্ঞানস্পৃহাটা বড়ই বলবতী, তাহারি উত্তেজনায় আমি আরও কিছু শিক্ষা লাভের জন্যে লালায়িত, তাই গুটিকতক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই কথাগুলিতে যদি আমার অত্যন্ত অসাধারণ অজ্ঞতা বা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় তদ্দৃষ্টে লেখক আমার প্রতি ঘৃণার পরিবর্ত্তে যেন কৃপাদৃষ্টিপাত করেন এইমাত্র প্রার্থনা। আমাদের দেশীয় লোকদের স্বভাবতই ব্যায়ামে বিরাগ ও ইয়ুরোপীয়দের তাহাতে অনুরাগ এ সম্বন্ধে লেখকেতে আমাতে কথনই মতভেদ ছিল না। ইয়ুরোপীয়ানদের সহিত সেই প্রভেদ ঘুচাইবার জন্যে, আমাদের যে মদ মাংস খাইতেই হইবে, এমন কোন কথা আমি কিনা কোন-খানেই বলিনাই, অতএব লেখক ঐ কথাটার উপরে যেরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাংস খাওয়া এ দেশীয় লোকের সাধ্যায়ত্ত কিনা, ইয়ুরোপায়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি যেরূপ ভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন তদ্দ্বারা এই অল্প বয়সে তাঁহার এতাদৃশ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হইলাম।

লেখক বলিয়াছেন "আমাদের ব্যায়াম চর্চ্চা কর্ত্তব্য বোধে করিতে হইবে" আমিও তো তাহাই বলিতেছি। "ছাত্রেরা যে খেলা ধূলা আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে।" সে কারণটি কি? তাহারা যে "বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া এরূপ করে না" তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমার তো বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, ছাত্রদের বিশ্বাস যে, এই কষ্টগুলি ভোগ করিলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর কতকগুলি কষ্টের হাত এড়াইতে সক্ষম হইবার পক্ষে খুবই সম্ভাবনা আছে। এই বিশ্বাসের জোরেই তাহারা "বিদেশী চালকড়াই ভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইতে" এবং "বীজগণিতের কঠিন আঁটি গিলিতে" চেষ্টা পায় ও তাহাতে কৃতকার্য্যও হয়। বিদ্যা শেখা না শেখার ফলাফল তাহাদের যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং ঐ বিশ্বাসটি তাহাদের হৃদয়ে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে সেইরূপ, স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল পালন না করিলে শরীর যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত হয় না, অসম্পূর্ণ শরীরে মানসিক বৃত্তি সকলের যথোচিত স্ফূর্ত্তি কথনই হইতে পারে না, শরীর ও মন এ দুইই যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ না থাকিলে এ পৃথিবীতে কোন কাযই সুসিদ্ধ হয় না, কোন স্থায়ী উন্নতি লাভ করা যায় না—এইগুলি যদি তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় আর, শরীর ও মনের শুভাশুভ যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা 'এই বিশ্বাসটি তাঁহা-দের হৃদয়ে সেইরূপ বদ্ধমূল হয় তাহা হইলে যেমন নীরসতা সত্ত্বেও তাঁহারা "বীজগণিতের

আঁটি গেলেন" তেমনি ব্যায়ামে বিরাগ সত্ত্বেও তাহার উপকারিতা বোধে তাঁহারা তাহা করিবেন। যখন কর্ত্তব্য বোধে একটা কাজ করিয়া আসিতেছেন তখন কর্ত্তব্য বোধে আর একটা কাজ কেনইবা না করিতে পারিবেন, বিশেষত দুই কর্ত্তব্যেরই যখন সমান গুরুত্ব? দুই কর্ত্তব্যই বা কেন বলিতেছি, যখন শরীর সুস্থ না রাখিলে মন সুস্থ রাখা যাইতে পারে না তখন মনের প্রতি কর্ত্তব্য আর শরীরের প্রতি কর্ত্তব্য দুইইত একই কর্ত্তব্যের সামিল হইল। ছাত্রদের শরীরের প্রতি তাচ্ছল্য দেখিয়া মনে হয় যে, শরীর মনের নিকটসম্বন্ধ এখনও তাঁহাদের তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু লেখক একস্থানে বলিয়াছেন যে "ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়াম চর্চ্চায় শরীর সুস্থ হয়" তবে বোধ হয় তাহা জানিয়াও, ছ্যাক্ড়া গাড়ির কর্ত্তারা তাহাদের ঘোড়াকে যেরূপ ভাবে দেখে ছাত্রেরাও তাঁহাদের শরীরটাকে সেই ভাবে দেখেন—যত কম সেবায় যত অল্পদিনের মধ্যে যত বেশি কাজ দিতে পারে ততই ভাল। যত শীঘ্র যে কোন প্রকারে হউক চোকে মুখে খানিকটা বিদ্যা গুঁজিয়া পাস্‌টা দিয়া একটা দশ কুড়ি টাকার চাক্‌রি যোটাইতে পারিলে হয়। বস্ তাহা হইলেই পার্থিব সুখের একেবারে চূড়ান্ত সীমা হইল! হইল কি? না পাস্‌টা হইলেই চাক্‌রিটা হইবে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পাস্‌টা হইবার আগেই হয়ত বালক বিবাহ করিয়া বসিয়া আছেন, হয়ত তাঁহার দুএকটি ছেলে মেয়েও হইয়াছে। বালকের সেই বড় দুঃখের দশকুড়ি টাকার চাক্‌রিটি হস্তগত হইতে না হইতেই তাঁহার মস্তকের উপরে সংসারের বোঝা চারিদিক হইতে চাপিয়া পড়িল। তিনি তখন হা অন্ন হা অন্ন করিয়া নিজেও ঝালাপালা হইতে লাগিলেন আর তাঁহার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন আত্মীয় বন্ধুদিগকেও ঝালাপালা করিয়া তুলিলেন। ছ্যাক্ড়া গাড়ির ঘোড়ার শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল কেবল মাত্র সেই ঘোড়াতেই ফলে আর তাহাতেই শেষ হয়। কিন্তু বালকের শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল পুরুভুজের ন্যায় বালকের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় জীবন্ত হইয়া উঠে। অসম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত ও অপক্ব শরীর বালকের সন্তান সন্ততি কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সন্তানেরা ক্ষীণ কিম্বা রুগ্ন শরীর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহার পরে হয়ত যথাবশ্যক আহারাভাবে তাহাদের শরীরের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। এইরূপে মরিয়া বাঁচিয়া কোনপ্রকারে মানুষ হইতে থাকে। আবার পাছে বাপের বিপুল কষ্টরাশির কোন অংশ হইতে সন্তানটি বঞ্চিত হয় এই ভয়েই যেন বালক যত শীঘ্র হয় ছেলের লেখা পড়া আরম্ভ করিয়া দেন, তাহাকে ধমকাইয়া' মারিয়া, রাত-জাগাইয়া পাসের জন্যে প্রস্তুত করেন। এই অপূর্ণ, রুগ্ন, ভগ্ন শরীর লইয়া পাস টাস দিয়া ছেলে যদি বা আর কোন কালে কখন মাথা তুলিতে সক্ষম হয় সে সম্ভাবনা যেন সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিবার জন্যেই পাস দিতে না দিতেই পিতা পুত্রের গলায় একটি বধূ বাঁধিয়া দেন। বালক যে হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন স্বামীর দুঃখে, সন্তানের কষ্টে তাহার ত একদিনের তরেও চোকের জল শুকায় না। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বালকের শরীরের প্রতি অত্যাচারের ফল শুদ্ধ একজনে বা এক পুরুষে শেষ হয় না, ক্রমিকই বিস্তৃত হইতে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাঙ্গালী বালকের জীবনের এখন এই তিনটি কাজ হইয়াছে—জন্ম, পাস, মৃত্যু। জীবনের সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিবার এতই যদি তাড়াতাড়ি পড়িয়া থাকে তাহা হইলে গুষ্টিশুদ্ধ দগ্ধে দগ্ধে মরা কেন, জন্মের পরেই মৃত্যুটাকে আনিলেই তো সব ল্যাঠা একেবারে চুকিয়া যায়—সব জ্বালা যন্ত্রণার হাত চট করিয়া চিরকালের মত এড়ান যায়।

একটা একজামিন পাস্ করিয়া যৎকথঞ্চিত গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিতে পারিলেই কি মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন হইল? আমরা কি কেবল একজামিন পাস করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মনুষ্য জীবনের কি উহা অপেক্ষা উচ্চ আশা, মহৎউদ্দেশ্য আর কিছুই নাই? সত্য বটে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, কিন্তু তাহাই বা সুসম্পন্ন হইতেছে কোথায়? আর, ঐ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে সে যে আত্মঘাতী উপায়!! ছেলের অন্ন বস্ত্রের উপায় করিতে গিয়া, যে শরীরকে সে অন্ন পোষণ করিবে, যে শরীরকে সে বস্ত্র আবৃত করিবে সেই শরীরকেই যে ক্ষয় করিয়া ফেলা হইতেছে। ছেলের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাকে যে অতি দ্রুতপদে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছ। বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার মাথার ভিতরে বিদ্যা ঠাসিয়া ঠাসিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিভূমিকেই যে একেবারে চাপিয়া পিশিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছ। এ যে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা!!! ইহা দেখিয়া জানিয়া বুঝিয়া তবুও কি ইহার প্রতিকারের কোন উপায় অবলম্বন করিবে না? আমাদের অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া কি মন্দকেই আমাদের অঙ্গের আভরণের মত করিয়া দেখিব? আমাদের আশা ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্যকে একেবারে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিব, গণ্ডির বাহিরে দৃক্‌পাতও করিতে দিব না? আমরা তো আর উদ্ভিদ্ হইয়া জন্মাইনি যে, যে অবস্থায় জন্মিয়াছি সেইখানে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেই হইবে।

লেখক ব্যায়ামের উপকারিতা স্বীকার করিয়া তাহার একটি বাধা দেখাইয়াছেন—সময়ের অভাব। সময়াভাবের দুইটি কারণ দিয়াছেন ১ম দরিদ্রতা, ২য় দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা। প্রথম বাধার সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহাই প্রথমে বলি, ব্যায়ামের অর্থ—শারীরিক পরিশ্রম। আমরা সচরাচর, যে পরিশ্রম আমরা সখ করিয়া করি তাহাকে বলি ব্যায়াম। পরিশ্রমের কাজ এই যে, সমস্ত শরীরটা খানিকটা নাড়াচাড়া পাওয়াতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেশ ভাল রূপে রক্ত চলাচল হয় এবং সেই জন্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যথোচিত পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। যে "দরিদ্র বালকদের ভাতে নুন যোটে না" তাহাদের যে দুই বেলা হাঁটিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতে হয় এ বিষয়ে বোধ করি কাহারও কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না, তদ্ব্যতিত তাহাদের অনেক সময়ে বাজারে যাইতে হয় ও নানাবিধ কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে নানা স্থানে আনাগোনা করিতে হয়। দরিদ্র বালকদের দায়ে পড়িয়া হয়ত এত পরিশ্রম করিতে হয় যে, তাহাদের পক্ষে "ব্যায়ামের" অপেক্ষা "বিরামের" উপদেশ অধিক উপযোগী।

২য় বাধা—দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা হেতু সময়াভাব। ৯টা ১০টা বেলায় ছেলেরা স্কুলে যায়, তিন চারিটার সময় বাড়ি আসে। ইহাতে তাহাদের প্রত্যূষে এক ঘণ্টা কাল ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক ঘণ্টাকাল ব্যায়ামের আমি ত কোন বাধা দেখিতে পাই না। সমস্তক্ষণ স্কুলে পড়িয়া শ্রান্ত মস্তিষ্কে, পথের রৌদ্রের তাপে শীর্ণ শরীরে বিকালে বাড়ি আসিয়াই তখনি আবার পড়িতে বসিলে স্বাস্থ্যেরত হানি হয়ই, তদ্ব্যবতিত শরীর মনের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তৎকালে পাঠাভ্যাস অন্য সময় অপেক্ষা অধিক আয়াস সাধ্য হইয়া উঠে। স্কুল হইতে আসিবার পর খানিকটা ব্যায়াম দ্বারা শরীর মন বেশ তাজা হইয়া উঠিলে তখন আবার পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সকল দিকেই মঙ্গল।

আমাদের বিদেশী ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয় ইহা বড়ই কষ্টকর, এ কষ্ট

আমি লেখকের স ঁ ঠিক সমান ভাবে অনুভব করিতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কর্ম্মফল স্বরূপ এই কষ্ট আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু আমাদের এই একটা অসুবিধা ঘটিয়াছে, এই একটা কষ্টভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া সেই দুঃখে গা ঢালিয়া দিয়া শারীরিক, মানসিক উন্নতির আর সকল প্রকার উপায়ের প্রতি কি আমরা অন্ধ হইয়া থাকিব এবং এইরূপে আরও পাঁচরকম অসুবিধা, আরও পাঁচটা কষ্ট আপনাদের উপরে চাপাইব? ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের ভাষা এদেশে প্রচলিত করিয়াছে সেই অভিমানে আত্মহত্যা করিয়া আমরা কি তাহার শোধ তুলিতে উদ্যত হইয়াছি? না ইংরাজদের উপর আড়ি করিয়া শরীর মন এমন ক্ষীণ করিয়া ফেলিতে হইবে যে আর কোন কালে তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়িবার কোন সম্ভাবনা না থাকে? জ্বর হইয়াছে বলিয়া কি ঔষধ পথ্যের প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া বিকার পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে হইবে? এই কি উচিত? কষ্ট নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া কেবল যদি খেদ করিয়াই কাল কাটাই তাহাহইলে এই সমস্ত কষ্টের বোঝা আমাদের সন্তান সন্ততির মাথায় চাপাইয়া আমরা কি পাপের ভাগী হইব না?

এখন তোমাদের—বালকদের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তোমরাই আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। তোমরা বিদেশীয়দের জ্ঞান সকল সুন্দররূপে পরিপাক করিয়া স্বদেশীয় রক্তমাংসে পরিণত করো। নানা ভাষা হইতে নানা রত্নরাজি আহরণ করিয়া দুঃখিনী মাতৃভাষার অভাব সকল শীঘ্র শীঘ্র দূর কর। তাহা হইলে বিদেশীয় ভাষায় বিদ্যা উপার্জ্জনের কষ্ট আর সহিতে হইবে না। যত দিন পরিবার পোষণে সক্ষম না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিও না। তাহা হইলে দরিদ্রতার দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন নববধূকে ঘরে আনিবার জন্যে মা তোমাকে অনুরোধ করিবেন তখন তুমি মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিও, মা, আমরা এই কয়জনেই অন্ন বস্ত্রের ক্লেশে সারা হইতেছি এখন আবার ঘরে আরও লোক আনিয়া কেন আমাদের দুঃখ কষ্ট বাড়াইয়া তুলিব, আর কি করিয়াই বা একটি সুকুমারী বালিকাকে আমাদের এই দারুণ দুঃখ ক্লেশের ভাগী করিব—মা, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম না হই ততদিন তুমি আমাকে এই অনুরোধটি করিও না। মা পরম স্নেহময়ী, তিনি যখন বুঝিবেন যে পুত্র এখন বিবাহ করিলে যথার্থই পরিবারস্থ সকলের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে তখন তিনি আর এ অনুরোধ করিবেন না। তোমাদেরই হাতে সকলিই রহিয়াছে। তোমরা দলবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কোন্ মহৎ কার্য্য না সুসিদ্ধ হইতে পারে। তোমাদের স্বাস্থ্যের উপরেই দেশের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে—তোমাদের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে—তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

তোমাদের এই সকল কথা বলিবার, তোমাদের অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া এই "বালক" পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তোমাদের মঙ্গলই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাত ভাই চম্পা।

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে, সাতটি চাঁপা ভাই ;
রাঙ্গা-বসন পারুল দিদি, তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি কর্ত্তেছে টুক্‌টুক্!
ঘুমটি ভাঙ্গে পাখির ডাকে রাতটি যে পোহালো,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে চাঁপার মত আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে মুখখানি বের কোরে,
কি দেখ্‌চে সাত ভায়েতে সারা সকাল ধ'রে!

দেখ্‌চে চেয়ে ফুলের বনে গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে, চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায় দুষ্টু ছেলের মত,
লতায় পাতায় হেলাদোলা কোলাকুলি কত!
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌চে ভাই বোন্,
দুখিনী এক মায়ের তরে আকুল হল মন।

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন বুকের দুরু দুরু!
কেবল শুনি কুলুকুলু এ কি ঢেউয়ের খেলা!
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু সারা দুপুর বেলা।

মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে খুঁজে বেড়ায় কা'কে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁ করে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে শুন্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা মনে পড়ে আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে মেঘ চলেছে ভেসে,
পাখীগুলি উড়ে উড়ে চলেছে কোন্ দেশে!
প্রজাপতির বাড়ি কোথায় জানে না ত কেউ।
সমস্ত দিন কোথায় চলে লক্ষ হাজার ঢেউ!
দুপুর বেলা থেকে থেকে উদাস হল বায়,
শুক্‌নো পাতা খসে পড়ে কোথায় উড়ে যায়!
ফুলের মাঝে গালে হাত দেখ্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে কাঁদ্‌চে প্রাণমন।

সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল, স্তব্ধ পাখীর ডাক,
থেকে থেকে করচে কা কা দুটো একটা কাক!
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি, পূবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি চাঁপা ফুলের ঘরে।
"গল্প বল পারুল দিদি" সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে মনে পড়ে মাকে।

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে, ঝাঁঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল আট্‌টি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মাকে;
সকাল বেলা "জাগো জাগো" পারুল দিদি ডাকে।

বোম্বায়ের গান বাজনা।

তুমি আমাকে এদেশের গানবাজনা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ—আমার যা মনে হয় বলি। বাঙ্গালীরা যেমন গান বাজনা ভক্ত আমি যতদূর দেখিয়াছি এদেশের লোকেরা তেমন নয়। বাঙ্গালী আমোদপ্রিয় সৌখীন জাতি, আমাদের দেশে ভদ্রলোকদের মধ্যে যতটা সঙ্গীতের চর্চ্চা এদেশে সেরূপ দেখা যায় না। আমার একজন মহারাষ্ট্রী বন্ধু বলিতেছিলেন তিনি কলিকাতায় গিয়া দেখিলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তামাক ও সঙ্গীত প্রিয়—যে বাড়ীতে যাও একটা হুঁকা ও তানপুরা। হুঁকা তাঁর চক্ষে নূতন ঠেকিয়াছিল কেন না এদেশে উচ্চ জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে তামাকের বড় আদর নাই। কোন কোন স্থানে আফিম চলিত—কিন্তু ভদ্রসমাজে ধূমপান অতি বিরল। তানপুরা ছড়াছড়ি দেখিয়া প্রতীতি হইল বাঙ্গালীরা সঙ্গীতরসজ্ঞ। তাই বলিয়া এমন মনে করিও না যে এদেশে গীতবাদ্যের চর্চ্চা বা মর্য্যাদা আদবে নাই, তবে আমার মনে হয় যে সঙ্গীত-বিদ্যা প্রায়ই পেশাদারী লোকদের মধ্যে বদ্ধ। ভদ্রলোকের মধ্যে গান বাদ্যে সুনিপুণ অতি অল্পলোকই দেখা যায়।

সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে গীতের আদর্শ হিন্দুস্থানী খেয়াল ধ্রুপদ। এই সাধারণ নিয়ম—স্থানে স্থানে রূপান্তর দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে সাকী, দিণ্ডি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি জাতীয় ছন্দের গান শোনা যায় আর 'লাওনী' নামক একপ্রকার টপ্পা আছে তাহাই খাঁটী দিশি জিনিস। আমাদের দেশের খোলকর্ত্তাল সমেত সঙ্কীর্ত্তনের মত উৎসাহো-দ্দীপক সমবেত ধর্ম্ম সঙ্গীত শ্রুত হওয়া যায় না। এদেশে ধর্ম্ম প্রচারের অন্যতর উৎকৃষ্ট প্রণালী 'কথা'। একটা ধর্ম্মশিক্ষা নীতিসূত্র—তার ব্যাখ্যা—পরে গান ও উপন্যাস-ছলে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেখান—এই হচ্চে কথা। পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসাবলি বিবৃত করিয়া বলা বাঙ্গালা দেশের কথকতা—কথা একটু আলাদা ধরণের জিনিষ। কথার আদ্যোপান্তে একটা ভাবসূত্র গ্রথিত থাকে—সেইটি বিস্তার করিয়া শ্রাবকদের মনে মুদ্রিত করাই কথার উদ্দেশ্য। এই স্থলে যে সকল কবিতা ব্যবহৃত হয় তাহা তুকারাম প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন কবিদিগের কাব্যখনি হইতে সংগৃহীত। আমি একবার 'কথা' শুনিয়াছিলাম তাহাতে বিনয়ের মাহাত্ম্য, ঔদ্ধত্যের পরাভব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছিল। যে বিষয়টি অবলম্বন করিয়া কথা হইয়াছিল তাহা তুকারামের এই অভঙ্গ

লহানপণ দে গা দেবা
মুগী সাখরেচী রবা
ঐরাবতী রত্ন থোর
ত্যালা অঙ্কুশাচা মার

এই কবিতাটি কি তোমার সুশ্রাব্য বলিয়া বোধ হইল? থোর মার—দেবা রবা—এ কি অদ্ভুত মিল! এই শ্লোকটির অনুবাদ নিয়ে লিখিয়া দিতেছি—

হে দেব দেও নম্রপণা,
পিপীলিকা পায় মিষ্টকণা,
ঐরাবত বৃহত বারণ
তার শিরে অঙ্কুশ তাড়ন॥

'কথা' প্রসঙ্গে কবিতার মাঝে মাঝে এক একটা গান আসে। গানের ধুয়ায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ কথকের সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেন—অবশেষে কথক মহাশয়ের বন্দনাদি হইয়া কথা ভঙ্গ হয়।

আমি এই মাত্র বলিলাম গানবাজনা পেশাদারের মধ্যে বদ্ধ কিন্তু এ নিয়মের একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে। গুজরাটে গরবা বলিয়া এক প্রকার সঙ্গীত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। ভদ্র ঘরের স্ত্রী পুরুষ ইহাতে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হন না। আশ্বিন মাসে নবরাত্রি উৎসবের আরম্ভ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই গরবা গানের ধুম লাগিয়া যায়। আহমদাবাদ সুরাট বরদা প্রভৃতি গুজরাটের প্রধান প্রধান সহরে কুলস্ত্রীগণ গরবা গান করে। নাগর ব্রাহ্মণ গুজরাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত, সুরাটের নাগর রমণীগণ গরবা গানের জন্য বিখ্যাত। এই গানের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম। বিবাহ প্রভৃতি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে কখন কখন নাগর রমণীগণের গরবা গান হয়। যাঁহারা তাহাদের মধ্যে সুগায়ক, বন্ধুবাটীতে গান গাহিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয়। গরবা একজনেও গাইতে পারে কিন্তু সচরাচর একদল মিলিয়া গায়। গরবা গাইবার রীতি এই—একদল গায়িকা চক্র বাঁধিয়া ঘুরিয়া করতালি দিতে দিতে গান আরম্ভ করে। আরম্ভের সময় প্রধান গায়িকা দুই এক তান ধরে পরে তাহাতে আর সকলে যোগ দেয়। প্রতি পংক্তি কিম্বা চরণ দুবার করিয়া গীত হয়। এমনও হইতে পারে যে কেবল ধুয়াতে সকলে সমস্বরে যোগ দেয়, অবশিষ্ট অংশ প্রধানা কর্ত্তৃক গীত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ণনা করিয়া ভাল বুঝান যায় না—শ্রবণেই ইহার স্বাদ গ্রহণ। অতএব আমার অনুরোধ এই একবার বোম্বাই আসিয়া এখানকার গীতবাদ্য শ্রবণ কর—দুর্গোৎসবের অবকাশ ইহার প্রশস্ত সময়।

'বাইনাচ' বলিলেই নৃত্যের প্রণালী কি বুঝিতে পারিবে। নাচের মধ্যে অবশ্য গান অন্তর্ভূত এমন কি প্রধান অঙ্গ বলিলেও হয়। এদেশে গানের ভাল ওস্তাদ সচরাচর দেখা যায় না—নর্ত্তকীর মুখেই যা কিছু ভাল গান শুনা যায়। আমার মনে আছে একবার কারওয়ারে একজন কর্ণাটী নর্ত্তকীর মুখে জয়দেবের কবিতা গান শুনিয়া ছিলাম, গান অতি চমৎকার আর তেমন শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও শুনা যায় না। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোকের মুখে প্রাকৃত দিবার রীতি আছে

কিন্তু সংস্কৃতও তাহাদের মুখে কত ভাল শুনায় তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এদেশে কেরল' * নামে একপ্রকার নৃত্য আছে, তাহাতে নটী পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া সুতাকাটা ঘুড়ি উড়ন সাঁপুড়ের ভেঁপু বাজান ইত্যাদি নানা বিষয়ের তালে তালে নকল করিয়া দেখায়। ইহাতে গতির কবিত্ব না থাক্—ইহা কৌতুকজনক নৃত্য বটে। কর্ণাটক দেশ নানাবিধ কলাকৌশলের জন্য বিখ্যাত।—ওদেশে নর্ত্তকী দলেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব। ইউরোপে সামান্যতঃ নরনারী একত্রে মিলিয়া নাচিবার রীতি আছে তাহা যদিও এদেশে দুর্লভদর্শন কিন্তু কোন স্থলে একদল নর্ত্তকী মিলিয়া নৃত্য করিতে দেখা যায়। কানেড়ায় দেখিতাম একদল নর্ত্তকী প্রতিজনে এক এক যষ্টিখণ্ড হস্তে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত—তালে তালে যষ্টির পরস্পর সজ্যট্টন—যে এক সুন্দর দৃশ্য—তাহাতে একটু চলা-ফেরার সৌন্দর্য্য দেখা যায়।

একবার একস্থানে 'পাল্‌কী' নাচ দেখিয়াছিলাম সে অতি চমৎকার। মনে কর একটী বালিকা পালকীর ভিতরে শয়ান।—আর পাল্কীটি তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। স্ত্রীলোকটির যে আসল পা তাহা নিচে পাল্কীর কাপড়ে অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। আর যে পা দেখা যায় তাহা নকল পা—ঠিক বোধ হয় একটী বালিকা পাল্কীর মধ্যে ঠ্যাসান দিয়া বসিয়া আছে আর তার বাহন কি-এক মন্ত্রবলে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

কালের বিচিত্র গতি। রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে। পুরাতনের রাজ্য গিয়া নূতনের অধিকার প্রস্তুত হইতেছে। এক্ষণে বাইনাচ যাত্রা কথা কাহারও ভাল লাগে না এখন নাটকের পালা পড়িয়াছে। যেখানে যাও পারসী নাটক হিন্দু নাটকের ডঙ্কাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। সে দিন এক পারসী নাটকের দলপতি আসিয়া আমাকে মুরব্বি ধরিয়াছিল—আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। অনেকগুল নাটকের ছাপা কাগজ আমার নিকট পাঠান হইল তাহার মধ্য হইতে আমার যাহা ইচ্ছা বাছিয়া লইলে সেই নাটক অভিনীত হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলা আমার মনোনীত হইল—তাহার অভিনয় দেখিয়া আমার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। শকুন্তলা একালের পারসী মেয়ের বেশে আসিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল—দুষ্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর নবেল-বর্ণিত প্রণয়ী। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ হিন্দুস্থানী ভাষাতে গান করিতে লাগিল। দুষ্যন্তের পুত্র সেও একেলে ধরণের বালক; পিতাকে দেখিয়া তাহার উপরে একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল। আর সে যে আশ্রম—যে ঋষি বালক যে কণ্বমুনি—কালিদাস স্বকৃত নাটকের এইরূপ অপব্যবহার দেখিলে কি মনে করিতেন বলিতে পারি না।

মহারাষ্ট্রীদের মধ্যেও নাটকের কতকগুলি বিখ্যাত দল আছে তাহারা শকুন্তলা,

---

* দাক্ষিণাত্য মালাবার বাসীগণ সংস্কৃত গ্রন্থে কেরল বলিয়া অভিহিত।

মৃচ্ছকটী, নারায়ণরাও পেশওয়ার বধ নাটক উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়া থাকে। এই সকল নাটকে গণেশ সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর নৃত্য গীত হইয়া রীতিমত কর্ম্মারম্ভ হয়। গুজরাতে ভাবইয়া নামে এক ভাঁড়ের দল আছে অনেক বৎসর হইল অহমদাবাদে একবার তাহার যাত্রা দেখিয়াছিলাম। যাত্রা কথাটি ঠিক হইল না। তাহাদের অভিনয়ে যাত্রার মত গানের প্রাচুর্য্য নাই—সংএর ভাগটাই অধিক। ভাবইয়ারা নকল করিতে বিলক্ষণ মজবুত। আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন বোম্বায়ে "সেয়র-মেনিয়া" রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই "সেয়র" কিনিবার জন্য পাগল। যে দরিদ্র সে এক রাত্রের মধ্যে ধনী হইবে—যার সচ্ছল অবস্থা সে লক্ষপতি—যে লক্ষপতি সে ক্রোড়পতি হইবে—সকলেই সহজ উপায়ে টাকা করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ গুজরাটী মহারাষ্ট্রী সকলেই সেয়র কিনিবার জন্য লালায়িত। যাহার সঙ্গতি আছে সে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ব্যাঙ্কের এক সেয়র লাভ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। সেই ঝোঁকে ইংরাজী দেশীয়ের মধ্যে অনেক মেলামেশা হইত—নেটিব তখন নীচ বলিয়া ঘৃণিত হইত না। লক্ষ্মীর অনুগ্রহে ইংরাজ নেটিব দিনকতক সমকক্ষ হইয়া চলিয়াছিল—তাহাদের তখন গলাগলি ভাব দেখে কে? "সেয়র" বাজারের রাজা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—তিনি তখন ক্রোড়পতি—তাঁহার অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে সেয়রের বাজার নিয়মিত হইত। ইংরাজেরা তখন তাঁহার দরবারে গিয়া খোষামোদ করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না। মেমসাহেব পর্য্যন্ত কখন কখন সেয়র ভিক্ষা করিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই গুজরাতী ভাঁড়েরা সুন্দর নকল করিয়াছিল। সাহেব তাঁহার মেমকে সঙ্গে লইয়া সেয়র আবদারের জন্য বাহির হইয়াছেন—এদিকে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাস্যের ফোয়ারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে ও কি গোলযোগ উপস্থিত! চটাপট চপেটাঘাতের শব্দ উপস্থিত। একজন ইংরাজ তাঁহার জাতির ওরূপ উপহাসজনক নকল সহিতে না পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তমমধ্যম প্রহার আরম্ভ করিলেন—সেই গোলমালে মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঁড়ের খেল বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল—আমরা হাসি কি কাঁদি কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না।

দশ দিনের ছুটি।

ছুটো ছেলে মিলিয়া এই বৈশাখের রৌদ্রে আমাকে বাড়ছাড়া করিয়াছে! দশদিন ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, কথাটা এই বই নয়, কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য উদয় হইলেও সংসারে এত গোলযোগ ঘটিত না। বড় ভাই যিনি, তিনি হাতের কাছে কলম পাইলে সেটাকে ভোঁতা করিয়া দেন, কাগজ পাইলে তাহাতে ছবি আঁকেন, ছুরি পাইলে স্থাবর জঙ্গমের উপর তাহার ধার পরীক্ষা করেন, ঘড়ি পাইলে কলটা বাহির করিয়া তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন, বই পাইলে বইয়ের পাতাগুলির বন্ধনমুক্ত করিয়া দেন, আমার কাঁধ পাইলে কাঁধের উপর চড়িয়া বসেন—এমন কত বলিব! যেখানে সিঁড়ি দিয়া চলিবার সম্পূর্ণ সুবিধা আছে সেখানে তিনি আল্‌সে দিয়া চলেন; গাড়ি থামিলে গাড়ি হইতে নাবা উচিত এইরূপ বিশ্বসুদ্ধ লোকের ধারণা, কিন্তু গাড়ি চলিতে চলিতে গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়াই ইনি একমাত্র কর্ত্তব্য বোধ করেন; গরমের দিনে রৌদ্র প্রখর এ কথা সকলেই স্বীকার করে কিন্তু আমি যে মানব সন্তানটির কথা বলিতেছি তাঁহার কাছে রৌদ্রে জ্যোৎস্নায় যে বিশেষ প্রভেদ আছে তাহা বোধ হয় না। এইরূপ সাধারণের সহিত ইঁহার মতের ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকাতে ইস্কুলের ছুটির সময় পল্লিতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়। বড় ভাইটি সম্প্রতি এইরূপ ছুটি উপলক্ষে দশ দিন ছাড়া পাইয়াছেন, চতুর্দ্দিকে এ কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, রুষ-ইংরাজের যুদ্ধের খবরেও দশ দিক এত বিচলিত হয় নাই। এদিকে ইঁহার ছোট বোনটি মাঝে মাঝে আসিয়া আবদার করিতেছেন—"কাকা—," কাকা বলিলে ত রক্ষা ছিল, দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া আমার নূতন নামকরণ হয়, কোন সভ্য দেশে সেরূপ সৃষ্টি ছাড়া নাম প্রচলিত নাই; এই ছেলেপিলেদের দৌরাত্ম্যে আমার জিনিষপত্রও সমস্ত লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়, আমার নিজের নামেরও একটা ঠিকানা থাকে না। আমার নিজের নাম যে আমার নিজের সম্পত্তি, এটা কিছুতেই তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। যাহা হউক, ছোট মেয়েটি আসিয়া (তিনি যে নিতান্ত ছোট তাহা নয়) ধরিয়া পড়িলেন "কাকা, আমাদের সঙ্গে লইয়া হাজারিবাগে চল।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। এই রৌদ্রের দিনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আট দশ দিনের মত বেড়াইয়া বিশেষ কিছুই দেখা হয় না। তবে, বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে একবার উঁকি মারিয়া আসা হয়। একবার উদার-বিস্তৃত নীলাকাশের তলে, উদার-বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া দুই দণ্ডের জন্য আপনাকে কারামুক্ত বলিয়া অনুভব করা যায়। আমরা সহরে থাকি, পৃথিবীটা যে নিতান্ত ইঁট কাঠ

সুরকিতে গড়া নয় মাঝে মাঝে তাহার প্রমাণ লইয়া আসা আমাদের পক্ষে বড়ই আবশ্যক হইয়া উঠে।

আমরা চার জনে যাত্রা করিলাম। ছেলেটি ও মেয়েটির পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। আরেকটির পরিচয় বাকী আছে। ইনি একটি মোটাসোটা, গোলগাল, শাদাসিধে মানুষ। আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু ছেলেদের চেয়ে ছেলে মানুষ। ইঁহার হৃষ্টপুষ্ট গৌরমূর্ত্তিখানি হাস্যরসের প্রাচুর্য্যে পাকা জামরুল ফলের মত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মস্ত হাঁড়ির মধ্যে ভাতের ফেন যেমন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটে আমাদের সঙ্গীটির পেটে হাস্যরস তেমনি যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে; কথায় কথায় বুগ্‌বুগ্ করিয়া নাকে চোখে মুখে উথলিয়া উঠে। একেকটি মানুষ আছে যেন সন্দেশের মত, তাহার ছাল নাই, আঁটি নাই, কাঁটা নাই, ছানায় চিনিতে মাখামাখি হইয়া থল্‌থল্ করিতেছে, আমাদের নির্ব্বিবাদী নিষ্কণ্টক নিরীহ সঙ্গীটি সেই ধরণের পরম উপাদেয় মানুষ।

রাত্রে হাবড়ার রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে জাগরণে, খিচড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে ষ্টেষণের নাম হাঁকা, আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্ধান, সমস্ত অন্ধকার সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর ষ্টেষণে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম। এ কি নূতন দেশ! আমাদের সমতল দেশটা যেন হঠাৎ কি এক্‌টা গোলযোগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফাটিয়া গেছে। চারিদিকে উঁচুনীচু, কঠিন, ভাঙ্গা; ছোট বড় শালগাছে পরিপূর্ণ। শালগাছ অনেক আছে বটে কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশের মত গাছে গাছে তেমন গলাগলি ভাব নাই। প্রত্যেক গাছ আপনাপন জমিতে স্বতন্ত্র স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে উদ্ভিদ্ পরিবারের মধ্যে যেমন একান্নবর্ত্তিত্বের সহস্র বন্ধন, লতায় পাতায় গুল্মে গাছে জড়াজড়ি, এখানকার কঠিন মাটিতে সে ভাব দেখিলাম না। এখানকার মানুষদের মধ্যেও বোধ করি সেইরূপ ভাব। লোকালয় বড় দেখা যায় না। দৈবাৎ মাঝে মাঝে এক একটা কুটীর সঙ্গীহীন দাঁড়াইয়া। আমাদের বাঙ্গলা দেশের ভিজে হাওয়ায় গাছে পালায় মানুষে মানুষে কুটীরে কুটীরে যেন গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়, এখানকার শুক্‌নো ঝর্‌ঝরে জায়গায় সকলেই যেন ছাড়াছাড়া হইয়া থাকে! গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙ্গা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকা-রেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড় বড় কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে একেকটা মুণ্ডের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল। আকাশের নীল

মেঘ খেলা করিতে আসিয়া যেন পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে। আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাথা তুলিয়াছে কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ, একজন কালো, ঝাঁক্‌ড়া চুলের ঝুঁটি বাঁধা, গালের হাড় চওড়া মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙ্গল যোড়া, এখনও চাষ আরম্ভ হয়নি, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক এক জায়গা ঘৃতকুমারী গাছের বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার, তক্‌তক করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধান ইঁদারা। চারিদিক বড় শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুক্‌নো শাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকাচুলের মত দেখাইতেছে। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন কুলের গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক্কেকটা অশথ গাছ আমগাছও দেখা যায়। শুষ্কক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটীরের চাল-শূন্য ভাঙ্গা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে এক্‌টা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধিষ্টেষণে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেলগাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। এ'কে কি আর গাড়ি বলে? চারটে চাকার উপর একটা ছোট খাঁচা মাত্র। সেই খাঁচার মধ্যে আমরা চারজনে চারটে পক্ষীশাবকের মত কিচিমিচি করিতে করিতে প্রভাতে যাত্রা করিলাম। ছোট দুটি ভাইবোনে আনন্দের প্রভাবে নানা কথা বলিতে এবং নানা উপদ্রব করিতে লাগিল, এবং আমাদের হৃষ্টপুষ্ট সঙ্গীটি ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া এমনি বালক বনিয়া গেলেন, যে, তাঁহার দেখাদেখি আমারও যেন চোদ্দ বৎসর আটমাস বয়স কমিয়া গেল। সর্ব্ব প্রথমে গিরিধি ডাক বাঙ্গলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাঙ্গালার যতদূরে চাই ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকত গাছ আছে। চারিদিকে যেন রাঙামাটীর ঢেউ উঠিয়াছে। একটা রোগা টাট্টু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারিদিকে চাহিয়া কি যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, কোন কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুল্‌কাইতেছে। আরেকটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মত একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ পদার্থ পট্‌পট্‌ করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। গিরিধিতে পাথুরে কয়লায় খনি আছে কিন্তু সময়াভাবে দেখা হইল না। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেশ্রষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও-রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্‌গড়্‌ করিয়া দ্রুতবেগে ঢালুরাস্তায় নামিয়া

যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিপি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া আছে; এই পাহাড়গুলাকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ হইয়াছে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হঁচট্ খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যার একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল "বড়াকর নদী।" টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে তাহাতে চার পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যদিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি, চারিদিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই; চারিদিকে উঁচুনীচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মত ধূধূ করিতেছে। দিক্ দিগন্তরের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্ এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মত একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোন মতে জাগিয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘন পত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীলশিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক একটা গাছ; তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামের জঙ্গল কোথায় গেল! সুদূরবিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদের ছাগলের মত ছোট ছোট দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গরুর কাঁধে লাঙ্গল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে। হাজারিবাগের কাছাকাছি

আসিয়াছি। পথের ধারের দুই একটা পাহাড় প্রাচীনকালের তুমুল প্রাকৃতিক বিপ্লবের স্মরণস্তম্ভের মত জাগিয়া আছে।

বেলা তিনটের সময় হাজারিবাগের ডাক বাঙ্গলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ সহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সাহরিক ভাব বড় নাই। গলি ঘুঁচি, আবর্জ্জনা, নর্দ্দামা, ঘেঁসাঘেঁসি, গোলমাল, গাড়ি ঘোড়া, ধুলো কাদা, মাছি মশা, এ সকলের প্রাদুর্ভাব বড় নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে সহরটি তক্‌তক্ করিতেছে। কলিকাতার বাড়িগুলো যেমন দৈত্যের মত দর্পে পাষাণ চরণে পৃথিবীকে মাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে এখানে সে রকম নয়। এখানকার খোলার চাল দেওয়া ধব্‌ধবে ছোট ছোট বাড়িগুলি যেন প্রকৃতির সঙ্গে ভাবসাব করিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের জারিজুরি নাই, জোরজার খাটে না। সহরটি গাছপালার মধ্যে যেন একটি নীড়। চারিদিকে সুগভীর শান্তি ও স্তব্ধতা। এমন কি, শুনা যায় এখানকার বাঙ্গালীরাও নাকি দলাদলি করেন না। তা যদি হয় তবে নিশ্চয়ই এখানকার দায়ে কুমড়ায়, কাকচিলে, কুকুরে বিড়ালেও সদ্ভাব আছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুর বেলা। ডাকবাঙ্গালার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ শাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো মেঠো ঘেসো ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুই শালিথ বারান্দায় আসিয়া চকিত ভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি। লোক জনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া কেউ কাঁধে মোট লইয়া কেউ দুয়েকটা গরু তাড়াইয়া, কেউ এক্‌টা ছোট টাট্টুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরেসুস্থে চলিতেছে; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয় এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মত হাঁসফাঁস করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গরুর গাড়ির চাকার মত আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুলুকুলু করিয়া যায়, জীবন তেম্‌নি করিয়া যাইতেছে। সম্মুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্ত্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকীলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হাহা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যখন ঢিলেঢালা ভাব, জীবনের মৃদুমন্দ গতি, তখন ঘণ্টার শব্দ বড় গম্ভীর। মাঝে মাঝে এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে চারিদিকের শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময়

মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতিঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে "আর কেহ জাগুক্ না জাগুক্ আমি জাগিয়া আছি!" কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে। নিতান্ত অচেতন তন্দ্রা নয়। চারিদিকের প্রকৃতির শান্তি ও সৌন্দর্য্য আমাকে সস্নেহে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সে টুকু অনুভব করিতেছি কেবল খুঁটিনাটি সম্বন্ধে চেতনা লোপ হইয়া যাইতেছে।

হাজারিবাবের কথা যাহা বলিবার তাহাত বলিলাম; (অনেকে মনে করিতেছেন এতটা না বলিলেও চলিত) কেবল এখানে আমাদের একজন বন্ধুর ছেলে মেয়ের সঙ্গে নূতন আলাপ হইয়াছে তাহাদের কথা কিছু বলি নাই। উপেন বাবু আখ্যানমঞ্জরী পড়েন, সুতরাং তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়; আমি তাঁহার কাছে কথ আওড়াই-বার সময় মন্দবুদ্ধিবশতঃ তয়ের পর ফ বলিয়াছিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু তাঁহার মিষ্টিমুখ দুষ্টু বোনটি অনেক সাধ্য সাধনায় আমাদের সঙ্গে একটি কথাও কহিলেন না। আমি তাঁহাকে "আর্টিকেল" লিখিয়া জব্দ করিব এমনতর শাসাইয়া আসিয়াছিলাম, আজ সেই প্রতিজ্ঞানুসারে, তাঁর সেই লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ আঁকানি বাঁকানির কথা, অতিথির হাত এড়াইয়া ছুটিয়া পালাইবার কথা জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়া দিলাম। আর আমাদের বন্ধুর নিকট হইতে যে সুমিষ্ট সন্দেশ এবং সুমিষ্টতর সমাদর পাইয়াছিলাম সে কথাও গোপন করিতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিবার সময়, সময় সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশে দুই চাকার ছোট গাড়িতে করিয়া আসিয়াছিলাম! আর কিছু না হউক তাহাতে পরমায়ু-সংক্ষেপ হইয়াছে। ঝাঁকানীর চোটে শরীরের প্রত্যেক হাড়ে হাড়ে গাঁঠে গাঁঠে লাঠালাঠি বাধিয়া গিয়াছিল। যে পঞ্চভূতে শরীরটা নির্ম্মিত সেই পাঁচভূতে ভূতের নাচন নাচিয়াছে। কোন মতে শরীর ধারণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু শরীর ছাড়া আর কিছু ধারণ করিতে পারি নাই। হাতে বই ধারণ করা যায় না, মাথায় টুপি ধারণ করা যায় না, চোখে চষমা ধারণ করা যায় না, পেটে আহার ধারণ করা যায় না সর্ব্বাঙ্গে এমনি বিপ্লব উপস্থিত। ইহার উপরে রৌদ্রের প্রখর প্রভাব। বাড়ি হইতে ষোলআনা বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু যখন ফিরিলাম তখন বার আনার হিসাব মিলেনা এমনি অবস্থা। দশ দিনের ছুটি ফুরাইয়াছে। আঃ!

আশ্চর্য্য পলায়ন।

অবস্থা ভেদে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত বন্দীরা কেহ বা নির্ব্বাসনে গিয়া ছাড়া পায়, কেহ বা সেখানেও জেলখানায় থাকে। ছাড়া পায় বটে কিন্তু তাই বলিয়া যে দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা নহে। পাভ্‌লভ্ প্রথমোক্ত প্রকার বন্দী, অর্থাৎ তাহার

অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। সুতরাং তাহার সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তন করাতে আমি একটা গ্রামের মধ্যে ছাড়া পাইয়াছিলাম।

পালাইবার বাসনা থাকিলে এখনি পালাইতে হয়, আর সময় নাই। যে কোন সময়ে যে কেহ সমস্ত ফাঁস করিয়া দিতে পারে। আমার এখানকার সঙ্গীরা এবং যাহারা আরও পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে সকলেই আমার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছে। আমার নিজের বিন্দুমাত্র অসাবধানতাতে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। কোন মতেই আর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। কিন্তু অর্থ ব্যতীত কোন মতেই এমন দীর্ঘ পথে চলিতে পারা যায় না।

আমার নিকটে কিছুই ছিল না। আমার কতকগুলি পশমের কাপড় বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিলাম। এখন এত অল্প কাপড় অবশিষ্ট রহিল যে তাহাতে সাইবিরিয়ার দুরন্ত শীত কিছুমাত্র নিবারণ হয় না। তবু আর বিলম্ব করিতে সাহস পাইলাম না। পরদিন বেলা দশটার সময় বাহির হইলাম, খুব শীত পড়িয়াছিল কিন্তু আকাশ নির্ম্মল ছিল। আমার অবস্থা গোপন করিতে চেষ্টা পাইলামনা, কেন না আমার ছাঁটা চুল আর হল্‌দে রঙ্গের কাপড় আমাকে পলাতক বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছিল। কিন্তু তাহাতে আমার বড় ভয় হয় নাই, আমি দেখিয়াছিলাম যে পূর্ব্ব সাইবিরিয়ায় এরূপ লোকদিগকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে না আর ধরেও না। এইরূপে আটদিন গেল। শীতে, ক্ষুধায় বড়ই যাতনা পাইয়াছিলাম। এক একটা উপত্যকায় এমন ভয়ানক শীত যে, মনে হইত যে চলিতে চলিতে হয়ত আমার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে জমিয়া যাইবে। কোন কোন সময়ে উপত্যকার তলদেশ কুয়াসাচ্ছন্ন থাকিত। সে কুয়াসার মধ্যে দিয়া চলিবার সময় এমনি বোধ হইত যেন সূচিকা রাশিতে স্নান করিতেছি। শীতে অধীর হইয়া অনেক সময়ে দৌড়িয়া চলিতাম। প্রায়ই কোন এক কৃষকের স্নানের ঘরে রাত্রি যাপন করিতাম। সাইবিরিয়ায় অতি গরিব কৃষকেরও একটি বাষ্পীয় স্নানের ঘর থাকে, উত্তাপে আরক্ত পাথরের উপর জল ঢালিয়া বাষ্প প্রস্তুত করে।

একদিন বিকালে, যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল আমি একটি গ্রামে গিয়া বাসা খুঁজিতে লাগিলাম। আমাদের দলস্থ বন্দীদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, সঙ্গতিপন্ন লোক অপেক্ষা দরিদ্রের নিকটে ভিক্ষা ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাহারা বলিয়া দিয়াছিল, ধনীর দ্বারদেশে কখনই দণ্ডায়মান হইও না, বরং যে একেবারে দীনহীন তার ভাঙ্গা কুড়ে়য় যাইয়া আশ্রয় চাহিও, গরিবেরা গরিবের প্রতি যেমন মমতা দেখায় ধনীরা কখনই তেমন করে না। তাহারা অনেক দেখিয়া অনেক ভুগিয়া এই নিয়মটি আবিস্কার করিয়াছে, ইহার মূলে গভীর সত্য নিহিত। এই নিয়ম অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করিলাম। চাকচিক্যশূন্য একটি কুটীর দেখিয়া তন্মধ্যে

প্রবেশ করিলাম এবং, রুসিয়ার রীতি অনুসারে সেণ্টের ছবির সম্মুখে গিয়া ক্রুসের চিহ্ন করিলাম। দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুধারী একটি লোক করুণার্দ্র স্বরে বলিলেন "কি বাবা"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এক টুক্‌রা রুটি বিক্রয় করিবেন কি ?"

"হাঁ, রুটি পাবে এখন" এই বলিয়া আমার হাতে একখানি রুটি দিলেন।

"রাত্রিবেলা আপনার এখানে একটু স্থান দিবেন কি ?"

"তাহা যে পারিব এমন বোধ হয় না বাবা। তুমি একজন পলাতক, না ? আজকাল পুলিষের নিয়ম বড় কড়াক্কড়। ভ্রমণের অনুমতিপত্র না দেখিয়া যদি কোন লোককে আশ্রয় দি তাহা হইলে আমার দণ্ড হইবে। বাবা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"বন্দীর দল হইতে।"

"আমি তাই মনে করিয়াছিলাম। আমার কথাই ঠিক হইল, তুমি একজন পলাতক।"

আমি অতি কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম। আমার বোধ হয় আমাকে তখন এমনিই শীত-পীড়িত দীনক্ষীণ দেখাইতেছিল যে সে সময়ে আমাকে দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন "তোমরা সচরাচর স্নানের ঘরে শুইয়া থাক, না ? আচ্ছা তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো আমার স্নানের ঘরে গিয়া থাক, আর তো কোন স্থান দেখিতেছি না। সে ঘর আজ তপ্ত করিয়াছিলাম, সেখানে তুমি বেশ গরম থাকিবে।"

রুটিখানি হাতে করিয়া টেবিলের উপর গুটিকতক পয়সা রাখিয়া স্নানের ঘরে গেলাম। দেখিলাম ঘরটি বেশ গরম আছে, এত গরম যে আমার গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিতে হইল।

কৃষকদের স্নানের ঘরে ধূম নির্গমনের পথ প্রায়ই থাকে না, এই জন্যে ধূঁয়াতে সমস্ত ঘর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আমার ঝুলি হইতে একটি বাতি বাহির করিয়া জ্বালাইলাম। আমি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু ঘুমাইবার আগে বাতির চর্ব্বি এবং দেয়াল হইতে ঝুল লইয়া আমার কাপড়ের হলদে রং পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ না হউক রংগের এতটা পরিবর্ত্তন হইল যে খুব নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে আসল ব্যাপার সহসা কেহ টের পাইবে না।

রং করা শেষ হইলে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বাদে দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, ঘরের ভিতরে মোটা জুতার মচ্ মচ্ শুনিতে পাইলাম, তার পরে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে এক ব্যক্তি বেঞ্চের উপর আসিয়া আমার পাশে শুইয়া পড়িল। আমি নিস্তব্ধ পড়িয়া রহিলাম, সেও কোন উচ্যবাচ্য করিল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উঠিয়া যাত্রা করিলাম।

এই গ্রাম হইতে ৭৫ ক্রোশ দূরে আমার একটি বন্ধু থাকিতেন। সেই খানে পৌঁছনই আমার উদ্দেশ্য। সমস্ত য়ুরোপের ন্যায় বৃহৎ একটা প্রদেশ নিঃসম্বলে পর্য্যটন করা অসম্ভব, আর যদিই বা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি ভ্রমণের অনুমতি পত্র না দেখাইলে কখনই সীমানা ছাড়াইতে দিবে না। আমি কখন কাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিতাম না কেননা তাহাতে ধরা পড়িবার খুব সম্ভব। আমার গণনানুসারে আমার গম্যস্থান এখনও ১৫ ক্রোশ দূরে। গ্রাম ছাড়াইয়া দেখিলাম পথপার্শ্বে একটি কুটীরের দ্বারে একটি লোক দাঁড়াইয়া আমাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তাঁহার ছাঁটা চুল, দাড়ি দেখিয়াই বুঝিলাম যে অতি অল্পদিনই শৃঙ্খলবদ্ধদল হইতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন "ওহে ভাই এইখানে এসে একটু বিশ্রাম করো এক পেয়ালা চা খাও।"

আমি আহ্লাদের সহিত তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। চা খাইতে খাইতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি অনেকদিন দল ছাড়িয়া আসিয়াছ ?"

"অল্পদিন হইল আসিয়াছি! আমি চতুর্থ সংখ্যক দলভুক্ত ছিলাম।"

"তুমি বুঝি ভাই পলাতক হইয়াছ ?"

"হাঁ। এখানে থাকিয়া লাভ কি ?"

"তা ঠিক বলেছ। এ বড় জঘন্য দেশ। আমিও দু এক মাসের মধ্যে তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিব। তুমি কোন্ পথে যাইবে, অঙ্গারা দিয়া ?

আমি তাঁকে একটা পথের নাম বলিলাম, কিন্তু আমি যে পথে যাইব তাহার ঠিক ঠিকানা বলিলাম না।

তিনি বলিলেন "আমি এ সমস্ত জায়গা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু তোমার অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আজকাল বড় গোঁয়ার হইয়া উঠিয়াছে, পথিক দেখিলেই আট্‌কায়। তোমার ভাই চারিদিকে চোক রাখিতে হইবে নতুবা চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিবে।" এই সংবাদে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহা হইলে এখন কি করিব ?" "শোন ভাই" এই বলিয়া যে যে পথে চলিলে, যে যে চাষার কুঁড়েতে রাত্রি কাটাইলে বিপদের সম্ভাবনা কম সেই সমস্ত নাম বলিয়া দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানকার পুলিষের লোকেরা আজকাল যে এত গোলযোগ করিতেছে তাহার কারণ কি ? আমি তো ভাবিয়াছিলাম পলাতকদের পক্ষে এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।"

"ঈশ্বর জানেন। হয়ত কোথাও একটা খুন হইয়াছে তাই খুনীকে খুজিতেছে।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। কিন্তু মনে হইল যে হয়ত আমার পলায়ন প্রকাশ পাইয়াছে তাই আমার খোঁজ করিতেছে। আমার এই অনুমানই শেষে ঠিক হইল।

আতিথ্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তথা হইতে বাহির হইলাম। সমস্ত দিন

রাত অবিশ্রান্ত চলিয়া একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় আমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়া দুয়ারে ঘা দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে বন্ধু নিজে আসিয়া দ্বার খুলিলেন।

বন্ধু বলিলেন "তোমার সমস্ত বিবরণ না শুনিলে তোমাকে কখনই চিনিতে পারিতাম না।"

"নিজেকে দেখিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।" এই বলিয়া একখানা আয়-নার সম্মুখে গেলাম। ধরাপড়া পর্য্যন্ত আয়নায় মুখ দেখি নাই।

দেখিলাম আমার চেহারার এমনি পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে অনায়াসেই মনে করিতে পারিতাম যে আমি আর এক ব্যক্তি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি আমার পলায়ন বৃত্তান্ত কখন শুনিলে?" "আজিই। এখানে রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারীরা প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রত্যেকের ঘর খুঁজিতেছে। ইহার আগের গ্রাম পর্য্যন্ত তাহারা তোমার সন্ধান পাইয়াছে, তুমি কাল রাত্রে কোথায় শুইয়া-ছিলে তাহা জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু তাহার পর তুমি যে কোথায় গিয়াছ তাহা এখনও টের পায় নাই। তোমাকে এখানে আসিতে কেহ দেখিয়াছে কি?"

"কেহ না।"

"ভাল। কিন্তু তবুও তোমার আর এক মুহূর্ত্তকালও এখানে থাকা উচিত হয় না। বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। যদিও পুলিষে জানিতে পায় নাই যে তুমি এখানে আসিয়াছ, কিন্তু তাহারা এখনও অনুসন্ধানে নিরস্ত হয় নাই, খুব সম্ভব কাল আবার এখানে আসিবে। তোমার এখানে রাত্রিযাপন করা উচিত নহে।"

"তবে কোথায়?"

"আমার কৃষিকার্য্যালয়ে যাও। যাইবার পূর্ব্বে তোমার বেশ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

আমরা আহার করিতে বসিলাম। বন্ধু বলিলেন "আমার কৃষিকার্য্যালয় একটা নিবিড় বনের মধ্যে, শিকার করিবার জন্যে অনেকে সেখানে যাইয়া থাকেন এই জন্যে তোমার যাওয়াতে আমার ভৃত্যেরা কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। সত্য বটে তোমার চুল ছাঁটা, কিন্তু এই রকম ভাবটা দেখাইলেই হইবে যে, তোমার যেন ভারি জ্বর বিকার হইয়াছিল তাই স্বাস্থ্য লাভের আশায় ওখানে গিয়াছ। তোমার যে প্রকার চেহারা হইয়াছে তাহাতে তোমার গোটা তিনেক ভারি ব্যারাম হইয়াছিল বলিলেও কেহ অবিশ্বাস করিবে না। আর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমার বন্ধু আমাকে সঙ্গে লইয়া নিজে গাড়ি হাঁকাইয়া চলিলেন। বন্ধুর বাড়ির আর কেহই আমার যাতায়াতের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পাইল না। পুলিষেরা একেবারে দিশেহারা হইল।

পরে জানিতে পারিলাম যে আমি ইর্কুট্স্ক্ হইতে আসিবার কিছুদিন পরেই আমার একজন সহযাত্রী বন্দী আমার সমস্ত ফিকির ফাঁস করিয়া দিয়াছিল। আমার পলায়ন প্রচার হইবামাত্রেই পুলিষ কর্ম্মচারীরা দিবানিশি অবিশ্রান্ত খোঁজ করিতে লাগিল। পথিক

পাইলেই ধরিয়া ফেলিত। তাহার পর জঙ্গলে একটা মৃতদেহ পাইয়া সেইটাকে আমার দেহ মনে করিয়া, তাহারা অনুসন্ধানে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে আর তিন ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁরা সকলেই আবার ধরা পড়িলেন।

একবৎসর কাল সাইবিরিয়ার কাটাইলাম। অবশেষে যখন দেখিলাম যে পুলিষ কর্ম্মচারীরা আমাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে তখন আমিও দেশ হইতে বাহির হইবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। ভ্রমণের অনুমতিপত্র নিতান্ত আবশ্যক। সেলীভানফ্ নামক এক মৃতব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়া আমি তাঁহার কাগজপত্র পাইলাম। সাইবিরিয়ার সীমা অতিক্রম করিতে দুই হাজার ক্রোশ পথ চলিতে হইবে, আমি ডাকগাড়ি করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। বন্দী অবস্থায় যে পথ দিয়া আসিয়াছিলাম এখন আবার সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম।

শৃঙ্খলবদ্ধ লোকদিগকে দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠিল, তাহাদিগের শুষ্ক শীর্ণ শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা আমার বিলক্ষণ পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উচ্চ বংশজাত বন্দীদিগের মধ্যে অনেক প্রিয়বন্ধুর মুখ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কোথায় আমি হৃদয়োচ্ছ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিব, না এখন আমাকে তাঁহাদের দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া থাকিতে হইল!

পথে যাইতে যাইতে একবার একস্থানে আমার ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়া ছিল। পথের একস্থান হইতে আমার একটি সহযাত্রী যুটিয়া গেল,লোকটি খুব আমুদে, সাদাসিদে। একদিন সন্ধ্যাকালে আমরা দুজনে একটা পান্থনিবাসে গিয়া আমাদের ভ্রমণের অনুমতিপত্র তথাকার কর্ত্তা ব্যক্তির হস্তে দিয়া আহারাদির পর, অতি প্রত্যূষে গাড়ি ঘোড়া প্রস্তুত রাখিবার হুকুম দিয়া শয়ন করিতে গেলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "গাড়ি ঘোড়া প্রস্তুত হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের অনুমতিপত্র আনিয়া দেও।"

ভৃত্য উত্তর দিল "সকলই প্রস্তুত, কর্ত্তা মহাশয় নিজেই অনুমতিপত্র লইয়া আসিতেছেন।"

অর্দ্ধঘন্টা পরে কাগজপত্র হাতে করিয়া কর্ত্তা মহাশয় উপস্থিত হইলেন, বিনীতভাবে বলিলেন "আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমার বড় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে আপনাদের মধ্যে কে সেলীভানফ্?" "কি আজ্ঞা করছেন মহাশয়" এই বলিয়া আমি দু এক পা সামনে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

কর্ত্তা মহাশয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া, ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বড় হাস্যজনকভাবে আমার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। তার পরে যোড়হাত করিয়া বলিলেন "আমি বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে মাপ করিবেন। কিন্তু যথার্থ, মহাশয়, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আসল কথাটা এই, সেলীভানফের সহিত আমার

আলাপ পরিচয় ছিল; তাঁর যে নাম, যে পদবী আপনারও ঠিক তাহাই দেখিতেছি, পিতার নামেতে, উপাধিতেও মিল আছে, কিন্তু আমি শুনিয়াছিলাম একবৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন—এখন এই অনুমতিপত্র দৃষ্টে সে কুসংবাদ মিথ্যা হইতে পারে মনে করিয়া আমার সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্তে আসিয়াছি। আমার ভুল হইয়াছে দেখিতেছি। আমি শত শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে মাপ করিবেন, মহাশয়, আমাকে মাপ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিনীতভাবে বার বার যোড়হাত করিতে লাগিলেন। আমার তখন এমনি মনে হইল যেন আমার পায়ের নীচে পৃথিবী দ্বিধা হইয়া আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কি করিয়া যে এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। এমন সময়ে "বাঃ কি মজা!" বলিয়া আমার সহযাত্রী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আর আমার পিঠ চাপড়াইয়া এমনি হাসিতে আরম্ভ করিলেন যে তাঁহার আর কথা বাহির হয় না। "কর্ত্তা মহাশয় বুঝি ভেবেছেন যে, তুমি একজন পলাতক বন্দী; কোন এক মৃতব্যক্তির কাগজপত্র যোগাড় করিয়া ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছ। হাঃ, হাঃ, হা, বড় মজা হইয়াছে!"

সহযাত্রী তাঁহার ভুঁড়িটি দুই হাতে ধরিয়া একবার এ পায়ে একবার ওপায়ে ভর দিয়া এমনি হাসিতে লাগিলেন যে তাঁর আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। আমি অতি কষ্টে তাঁর হাসিতে যোগ দিয়া বলিলাম "ঠিক বলিয়াছ, এ দেখিতেছি ভারি মজা হইয়াছে! মহাশয় আমাদের দেশে ধূলিকণার মত সেলীভানফের ছড়াছড়ি। আপনার বন্ধু আইভান সেলিভানফ্ আমার একজন আত্মীয় ছিলেন, তাঁতে আমাতে বড় সৌহার্দ্য ছিল। সেখানে এত লোকের ঐ নাম আছে যে, আপনি ইচ্ছা করেন তো যে-কোন দিন বিশ পঁচিশ জন সেলীভানফের সহিত আপনার আলাপ করিয়া দিতে পারি।"

ইহাতেই কর্ত্তাব্যক্তির সন্দেহ দূর হইয়াছে বোধ হইল, কেন না তিনি আর উচ্যবাচ্য না করিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। আমরা গাড়িতে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমার সহযাত্রীর হাসি আর কিছুতেই থামে না, তিনি, থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমাকে একজন পলাতক বন্দী ঠাওরাইয়াছিল! এ যে মজা হইয়াছে সে আর কি বলিব!"

ঐ ঘটনাতে আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে কি-একটা অতি সামান্য কারণে যে-কোন সময়ে আমি আবার ধরা পড়িতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে ইহার পর আমার আর কোন বিপদ ঘটে নাই। জেনেভায় পৌঁছিয়া আমার মনে হইল যে, যথার্থই আবার আমি স্বাধীন হইলাম।

রুসিয়ার দেশহিতৈষী-দিগের মধ্যে অধিকাংশের জীবনযাত্রা কি না শোক দুঃখে একেবারে পরিপূর্ণ এইজন্যে বোধ করি পাঠকেরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, মোক্রিয়েভিচ্ যদিও আজ পর্য্যন্ত দেশের জন্যে প্রাণদান করেন নাই কিন্তু তিনি, অন্যান্য পলাতক বন্দীদের ন্যায়, দেশে ফিরিয়া দেশের লোকের ক্লেশ নিবারণার্থে আবার পূর্ব্বেকার মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত প্রাণপণে যোঝাযুঝি করিতেছেন।

সূর্য্যকিরণের কার্য্য।

সূর্য্যকিরণের তরঙ্গের বিষয় গতবার আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু সেই সূর্য্যকিরণের তরঙ্গ দ্বারা আমাদের পৃথিবীর কি কি কায হইতেছে তাহা লিখিয়া সূর্য্যের কথা শেষ করিব। প্রথমতঃ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে আমরা কি করিয়া দেখিতে পাই তাহা বলা আবশ্যক। সূর্য্য উদয় হইলে সূর্য্যকিরণের ঢেউ প্রত্যেক বস্তুকে আঘাত করে। এবং তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারাই আবার আমাদের চক্ষে আসিয়া পতিত হয়। আমাদের চক্ষে প্রবেশ করিয়া ঢেউগুলি চক্ষের স্নায়ু গুলিকে যখন চঞ্চল করে তখন প্রত্যেক বস্তুর আকার আমরা মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারি। কতকগুলি বস্তু আছে তাহারা সেই ঢেউগুলিকে আমাদের চক্ষে ফিরাইয়া না দিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে দেয়, যেমন কাঁচ। সেই হেতু এই শ্রেণীর বস্তুগুলিকে আমরা স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া থাকি। আবার এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহারা সেই ঢেউ-গুলিকে তাহাদের মধ্যে কতকটা প্রবেশ করিতে দেয় ও অধিকাংশই আমাদের চক্ষে ফিরাইয়া দেয়, যেমন উজ্জল রৌপ্য, ইস্পাত, ইত্যাদি। দর্পণে যখন মুখ দেখি তখন সূর্য্যের ঢেউ প্রথমে আমাদের মুখে আসিয়া পড়িয়া আয়নায় ফিরিয়া যায়, পুন-রায় আবার তাহারা আয়না হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন আমাদের চক্ষের তারার মধ্যে প্রবেশ করে তখন নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাই। সূর্য্য-কিরণের আরেকটি গুণ আছে। ধরিতে গেলে পৃথিবীতে কোন জিনিষের কোন রং নাই। সূর্য্য-কিরণ হইতেই সকলে নানা রং পাইয়া থাকে। সূর্য্য-কিরণের মধ্যে যে রামধনুকের সাতটা রং আছে এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু সূর্য্য-কিরণে সেই সাতটা রং কেমন ভাবে আছে সেটা বলিলে বোধ করি কাহারো বিরক্তি বোধ হইবে না।

আমরা পূর্ব্বে সূর্য্য-কিরণকে তরঙ্গ বলিয়াছি। এখন বুঝিতে হইবে অনেকগুলি ভিন্ন আয়তনের তরঙ্গ একত্রে সার বাঁধিয়া আসিতেছে। সাতটা রং সাতটা বিভিন্ন আয়তনের ঢেউ। লাল রঙ্গের ঢেউগুলি সকলের চেয়ে বড় এবং আস্তে আস্তে চলে। যে ঢেউগুলি দ্বারা বায়লেট্ নামক এক প্রকার বেগুনি রঙ্গের আলো হয় তাহারা সর্ব্বা-

পেক্ষা ছোট ও কার্য্যক্ষম। তা ছাড়া কমলালেবুর রং, হলুদে রং, সবুজ রং, নীল রং, ঘোর নীল রঙ্গের ঢেউগুলি ভিন্ন আয়তন ধরিয়া আছে। এক ইঞ্চি জায়গায় যদি ৩৯০০০ লাল রঙ্গের ঢেউ থাকে তাহলে সেই জায়গায় ৫৭০০০ বেগুণি রঙ্গের ঢেউ থাকে ইহা পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে সূর্য্য-কিরণের এই সকল রঙ্গীন ঢেউগুলি যখন আমাদের চক্ষে আঘাত করিতেছে তখন আমরা রঙ্গীন আলো সর্ব্বদা দেখিতে পাই না কেন? নিয়মিত মাপে লাল, কমলালেবুর রং, হলুদে, সবুজ, নীল, ঘোর নীল, ও বেগুনি, এই কয়টি রং যদি একত্রে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে সাদা রং দাঁড়াইবে। পরীক্ষা করিতে চাওত একটি গোল মোটা কাগজে এই রংগুলি ক্রমান্বয়ে সারাসারি মাখাইয়া খুব জোরে ঘুরাইলে সেই রং গুলির পরিবর্ত্তে কেবল সাদা রং দেখাইবে। কেবল, সূর্য্যের রঙ্গের মত বিশুদ্ধ রং এখানে পাওয়া যায় না বলিয়া যতটা সাদা হওয়া উচিত ততটা সাদা দেখায় না। সেইরূপ সূর্য্যের আলোকের রঙ্গীন ঢেউগুলি একত্রে মিলিয়া একসময়েই তোমার চক্ষে আঘাত করিতেছে বলিয়া তুমি এই শুভ্র আলোক দেখিতে পাইতেছ। নানা দ্রব্য নানা রঙ্গের, ইহার অর্থ কি? তাহার কারণ এই—একেকটা জিনিষ সূর্য্য-কিরণের একেকটা রঙ্গের ঢেউ আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। মনে কর, গোলাপ ফুল সূর্য্যালোকের সমুদয় বর্ণ গ্রহণ করিতে পারে কেবল লাল রং টা পারে না, এই জন্য লাল রং গোলাপ ফুলের কাছ হইতে ফিরিয়া আসে সুতরাং লাল রংটাই আমরা দেখিতে পাই আর কোন রং দেখিতে পাই না। তাই গোলাপকে লাল বলি। গাছের পাতাগুলি সেইরূপ সূর্য্যের অন্য রঙ্গীন ঢেউ সকল আপনাদের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া কেবল সবুজ রঙ্গের ঢেউ ফিরাইয়া দেয়, সেই ঢেউ ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে আঘাত করিলে আমরা পাতাগুলির সবুজ রং দেখিতে পাই। যে সকল কাপড়ের সাদা রং তাহারা সূর্য্যের কোন রঙ্গীন ঢেউ আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, কিন্তু কালো কাপড় সমস্তটাই আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয়, কোন রংই ফিরাইয়া দেয় না। গাছের পাতা বা ফুল যে সকল ঢেউ তাহাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দেয় তাহাদেরই সাহায্যে তাহারা নিজের আহারের জন্য রস প্রস্তুত করে ও আহার হজম করে। সূর্য্যকিরণে এই যেমন আলোকের ঢেউ আছে সেইরূপ উত্তাপেরও ঢেউ আছে, রং যেমন ঢেউ, উত্তাপও তেমনি ঢেউ। উত্তাপের ঢেউ আলোকের ঢেউএর ন্যায় দ্রুত আসে না; এবং তাহাদের দেখিতেও পাওয়া যায় না। সূর্য্যের উত্তাপের ঢেউগুলি যদিও অদৃশ্য হইয়া আস্তে আস্তে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তথাপি সেইগুলির দ্বারাই আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। প্রথমতঃ তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে পৃথিবীতে আসিয়া জলের কণাগুলিকে পৃথক করে, জলের কণাগুলি পৃথক হইয়া বাতাসে ভাসিতে থাকে, এবং তাহারাই আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পতিত হইয়া নদ

নদী সৃষ্টি করে। উত্তাপের এই ঢেউগুলি বাতাসকে গরম ও হালকা করে বলিয়া ঝড় হয়। এই ঢেউগুলিই ভূমিকে উত্তপ্ত করিয়া উদ্ভিদ জাতিকে বর্দ্ধিত করে। আমাদের শরীরের উত্তাপ আমরা দুই উপায়ে পাইয়া থাকি। প্রথমতঃ এই ঢেউগুলি আমাদের গাত্রে আঘাত করে বলিয়া। দ্বিতীয় উদ্ভিদ্‌দিগের নিকট হইতে। উদ্ভিদ্‌দিগের নিকট হইতে যে কি উপায়ে উত্তাপ পাই তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উদ্ভিদেরা সূর্য্যের বর্ণ ও উত্তাপের ঢেউ নিজের শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহার করে। আমরা হয় সেই উদ্ভিদ সকল খাই নয়ত যে সকল জন্তুরা সেই উদ্ভিদ খায় তাহাদের আহার করি। যখন আমাদের আহার হজম হয় তখন উদ্ভিদ যে উত্তাপ সূর্য্যকিরণ হইতে প্রথমে গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই আবার আমাদের শরীরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবনকে রক্ষা করে। বৃক্ষের মধ্যে সূর্য্যের তাপ থাকাতেই বৃক্ষ এমন সহজে জ্বলিতে পারে। বৃক্ষ হইতেই পাথুরে কয়লার উৎপত্তি। বৃক্ষ এককালে সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ লইয়াছিল তাহাই এখন কয়লাতে লুকানো আছে। এই কয়লার সাহায্যে রেল-গাড়ি, জাহাজ ও পৃথিবীর কতশত কল চলিতেছে। নারিকেল, ভেরেণ্ডা, সরিষা প্রভৃতি গাছের ফল ও বীজের মধ্যে সূর্য্যের উত্তাপ লুকানো থাকে, সেই হেতু তাহাদের তৈল জ্বালাইলে আমরা আলোক পাই।

রাজর্ষি।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পাথরের ঘাট গোমতী নদীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপু-রার মহারাজা গোবিন্দ-মাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্র মাণিক্যও আসিয়াছেন। এমন সময়ে একটি ছোট মেয়ে তাহার ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে আসিল। রাজার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে ?" রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "মা, আমি তোমার সন্তান !" মেয়েটি বলিল "আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও না !" রাজা বলিলেন "আচ্ছা চল।" অনু-চরগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা কহিল "মহারাজ, আপনি কেন যাইবেন আমরা পাড়িয়া দিতেছি।" রাজা বলিলেন "না, আমাকে যখন বলিয়াছে, আমিই পাড়িয়া দিব।" রাজা সেই মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল। রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দির-সংলগ্ন

ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল, তখন চারিদিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মত তাহার ফুট্‌ফুটে মুখখানি হইতে যেন একটি বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ছোট ভাইটি দিদির কাপড় ধরিয়া দিদির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। সে কেবল একমাত্র দিদিকেই জানে, রাজার সঙ্গে তাহার বড় একটা ভাব হইল না। রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি মা?" মেয়ে বলিল "আমার নাম হাসি।" রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি।" ছেলেটি বড় বড় চোখ মেলিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিল না। হাসি তাহার গায়ে হাতদিয়া কহিল "বল্ না ভাই, আমার নাম তাতা।" ছেলেটি তাহার অতি ছোট দুইখানি ঠোঁট একটুখানি খুলিয়া গম্ভীরভাবে দিদির কথার প্রতিধ্বনির মত বলিল "আমার নাম তাতা।" বলিয়া দিদির কাপড় আরও শক্ত করিয়া ধরিল। হাসি রাজাকে বুঝাইয়া বলিল "ও কি না ছেলেমানুষ তাই ওকে সকলে তাতা বলে।" ছোট ভাইটির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল "আচ্ছা বল্‌দেখি মন্দির।" ছেলেটি দিদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "লদন্দ।" হাসি হাসিয়া উঠিয়া কহিল "তাতা মন্দির বলিতে পারে না, বলে লদন্দ।—আচ্ছা, বল্‌দেখি কড়াই।" ছেলেটি গম্ভীর হইয়া বলিল "বলাই।" হাসি আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল "তাতা আমাদের কড়াই বলিতে পারে না, বলে বলাই।" বলিয়া তাতাকে ধরিয়া চুমো খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল। তাতা সহসা দিদির এত হাসি ও এত আদরের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিকই মন্দির এবং কড়াই শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাতার সম্পূর্ণ ত্রুটি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না; তাতার বয়সে হাসি মন্দিরকে কখনই লদন্দ বলিত না, সে মন্দিরকে বলিত পালু, আর সে কড়াইকে বলাই বলিত কি না জানিনা কিন্তু কড়িকে বলিত ঘরি, সুতরাং তাতার এরূপ বিচিত্র উচ্চারণ শুনিয়া তাহার যে অত্যন্ত হাসি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাতা সম্বন্ধে নানা ঘটনা সে রাজাকে বলিতে লাগিল। একবার একজন বুড়োমানুষ কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাতা তাহাকে ভাল্লুক বলিয়াছিল, এম্‌নি তাতার মন্দ বুদ্ধি! আর একবার তাতা গাছের আতা ফলগুলিকে পাখী মনে করিয়া মোটামোটা ছোট দুটি হাতে তালি দিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাতা যে হাসির চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ, ইহা তাতার দিদি বিস্তর উদাহরণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ করিয়া দিল। তাতা তাহার বুদ্ধির পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ অবিচলিত চিত্তে শুনিতেছিল, যতটুকু বুঝিতে পারিল তাহাতে ক্ষোভের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। এইরূপে সেদিনকার সকালে ফুলতোলা শেষ হইল। ছোট মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন তখন রাজার মনে হইল যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল; এই দুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া এই পবিত্র হৃদয়ের আশমিটাইয়া ফুলতুলিয়া দিয়া তাঁহার যেন দেবপূজার কাজ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙ্গিলে সূর্য্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোট দুটি ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন; দুই ভাইবোনে ঘাটে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিত। যে দিন সকালে এই দুটি ছেলে মেয়ে না আসিত, সে দিন তাঁহার সন্ধ্যাআহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না। রাজাকে তাহারা পিতা বলিত। রাজা তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

হাসি ও তাতার বাপ মা কেহ নাই। কেবল একটি কাকা আছে। কাকার নাম কেদারেশ্বর। এই দুটি ছেলে মেয়েই তাহার জীবনের এক মাত্র সুখ ও সম্বল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাতা এখন মন্দির বলিতে পারে কিন্তু এখনো কড়াই বলিতে বলাই বলে। অধিক কথা সে কয় না। গোমতী নদীর ধারে নাগকেশর গাছের তলায় পা ছড়াইয়া তাহার দিদি তাহাকে যে কোন গল্পই করিত সে তাহাই ড্যাবাড্যাবা চোখে অবাক্ হইয়া শুনিত। সে গল্পের কোন মাথামুণ্ড ছিল না কিন্তু সে যে কি বুঝিত সেই জানে; গল্প শুনিয়া সেই গাছের তলায় সেই সূর্য্যের আলোতে, সেই মুক্ত সমীরণে একটি ছোট ছেলের ছোট হৃদয়টুকুতে যে কত কথা কত ছবি উঠিত তাহা আমরা কি জানি! তাতা আর কোন ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, কেবল তাহার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াইত।

আষাঢ়মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই কিন্তু বাদ্‌লা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূরদেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেত প্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে একশ-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত। হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা এক প্রকার সঙ্কোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ বাবা!" রাজা বলিলেন "রক্তের দাগ মা!" সে কহিল, "এত রক্ত কেন?" এমন এক প্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল "এত রক্ত কেন" যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, "বাস্তবিক, এত রক্ত কেন!" তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোট মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল "এত রক্ত কেন?" তিনি

উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগি-লেন, মনে মনে বলিলেন "গোমতী, তুই প্রতি বৎসর কত শত অসহায় নির্দ্দোষী জীবের রক্ত বহন করিয়া আসিতেছিস্, তোর জল এমন বিমল কেন?" হাসি জলে আঁচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোট হাত দুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল। হাসির আঁচলখানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া গেল তখন দুই ভাইবোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেই দিন বাড়ি ফিরিয়া গিয়া হাসির জ্বর হইল। তাতা কাছে বসিয়া দুটি ছোট আঙ্গুলে দিদির মুদ্রিত চোখের পাতা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে "দিদি!" দিদি অমনি সচকিতে একটুখানি জাগিয়া উঠিতেছে। "কি তাতা!" বলিয়া তাতাকে কাছে টানিয়া লইতেছে; আবার তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছে। তাতা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোন কথাই বলে না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া দিদির মুখের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল "দিদি তুই উঠ্‌বিনে!" হাসি চমকিয়া জাগিয়া তাতাকে বুকে চাপিয়া কহিল—"কেন উঠ্‌বনা ধন?" কিন্তু দিদির উঠিবার আর সাধ্য নাই। তাতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার সমস্ত দিনের খেলাধূলা আনন্দের আশা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই। কেদারেশ্বর একজন বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বৈদ্য নাড়িটিপিয়া অবস্থা দেখিয়া ভাল বোধ করিল না।

তাহার পর দিন স্নান করিতে আসিয়া রাজা দেখিলেন মন্দিরে দুইটি ভাইবোন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। মনে করিলেন এই ঘোরতর বর্ষায় তাহারা আসিতে পারে নাই। স্নান তর্পণ শেষ করিয়া শিবিকায় চড়িয়া রাজা বাহকদিগকে কেদারেশ্বরের কুটীরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনুচরেরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিন্তু রাজাজ্ঞার উপরে আর কথা কহিতে পারিল না। রাজার শিবিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিলে কুটীরে অত্যন্ত গোল-যোগ পড়িয়া গেল। সে গোলমালে রোগীর রোগের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কেবল তাতা নড়িল না, সে অচেতন দিদির কোলের কাছে বসিয়া, দিদির কাপড়ের এক প্রান্ত মুখের ভিতর পুরিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। রাজাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে!" উদ্বিগ্ন হৃদয় রাজা কিছুই উত্তর দিলেন না। তাতা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির কি লেগেছে?" খুড়ো কেদারেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন "হাঁ, লেগেছে।" অমনি তাতা দিদির কাছে গিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, তোমার কোথায়

লেগেছে?" মনের অভিপ্রায় এই যে সেই জায়গাটাতে ফুঁ দিয়া হাত বুলাইয়া দিদির সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে। কিন্তু যখন দিদি কোন উত্তর দিল না, তখন তাহার আর সহ্য হইল না—ছোট ছুইটি ঠোঁট উত্তরোত্তর ফুলিতে লাগিল, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতে বসিয়া আছে, একটি কথা নাই কেন? তাতা কি করিয়াছে যে তাহার উপর এত অনাদর! রাজার সমুখে তাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কেদারেশ্বর অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া তাতার হাত ধরিয়া অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তবুও দিদি কিছু বলিল না!

রাজবৈদ্য আসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। রাজা স্বয়ং বালিকার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় বালিকা প্রলাপ বকিতে লাগিল। বলিতে লাগিল "ও মাগো, এত রক্ত কেন?" রাজা কহিলেন "মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব!" বালিকা বলিল—"আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ রক্ত মুছে ফেলি।" রাজা কহিলেন "আয় মা আমিও মুছি!" সন্ধ্যার কিছু পরেই হাসি একবার চোখ খুলিয়াছিল। একবার চারিদিক চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। তখন তাতা অন্য ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে যেন না দেখিতে পাইয়া হাসি চোখ বুজিল। চক্ষু আর খুলিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হইল।

হাসিকে যখন চিরদিনের জন্য কুটীর হইতে লইয়া গেল তখন তাতা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছিল। সে যদি জানিতে পাইত তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়াটির মত চলিয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজার সভা বসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী দেবীমন্দিরের পুরোহিত কার্য্যবশতঃ রাজদর্শনে আসিয়াছেন।

পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এদেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবী পূজার চোদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় একদিন ছুইরাত্রি কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন তবে চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা উপলক্ষে সর্ব্ব প্রথমে যে সকল পশুবলি হয় তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বলির পশু গ্রহণ করিবার জন্য চোন্তাই রাজসমীপে আসিয়াছেন। পূজার আর বারো দিন বাকী আছে।

রাজা বলিলেন—"এ বৎসর হইতে মন্দিরে পশুবলি আর হইবে না।"

সভাস্থ লোক অবাক্ হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্র মানিক্যের মাথার চুল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।